বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা

শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া
এ. কে. এম. রাশিদুজ্জামান

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা

শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া
এ. কে. এম. রাশিদুজ্জামান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ কে এম নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

স্বত্ব ঃ লেখক দ্বয়ের

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৩

প্রচ্ছদ ঃ সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় ঃ বিশ টাকা মাত্র

Bangladesher Pararashtra Neetite Bhu Rajneetik Bastabata Writte by Shahidul Islam Bhuiyan & AKM Rashiduzzaman Published by AK Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masji Campus New Elephant Road Dhaka-1000 First Edition July 1993
Price Taka 20.00 only.

www.pathagar.com

১. ভূমিকা

প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি সেই দেশের ভূ-রাজনীতিক অবস্থান ও বাস্তবতার আলোকেই নির্মিত হয়। কোন রাষ্ট্রই এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণের পূর্বে প্রথমত ভূ-রাজনীতি কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

১.১ ভূ-রাজনীতি

আধুনিক ভূ-রাজনীতির প্রবক্তা Kjellen (১৮৬৪-১৯২২) এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন-

"Geopolitics is the theory of the state as a geographic organism or phenomenon in space, i.e, as land, territory, area."[১]

বিখ্যাত ভূ-রাজনীতিক Haushofer একে বলেন ঃ

"The science of political forms of life in their regional relationship as affected by natural conditions and historical development."[২]

সুবিখ্যাত 'হার্টল্যান্ড' তত্ত্বের প্রবক্তা N. J. Spykeman ভৌগোলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নকেই ভূ-রাজনীতি বলেছেন।[৩] শব্দগত অর্থেও আমরা বলতে পারি যে, ভৌগোলিক বিষয়াবলীর ভিত্তিতে যে রাজনীতি তাই ভূ-রাজনীতি। মূলত এটি একটি সহকারী বিজ্ঞান; কোন স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয় নয়। ভূ-রাজনীতি ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয় বিষয়েই অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে কর্ণেল জন কিফারের ভাষায় বলা যায়ঃ

'কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক, কৌশলগত এবং ভৌগোলিক উপাদানসমূহের প্রয়োগই ভূ-রাজনীতি।'

---

১. Luciu Carlson, *'Geography and World Politics'* p. 289

২. *প্রাগুক্ত।*

৩. *প্রাগুক্ত।*

www.pathagar.com

১.২ বাংলাদেশের মৌলিক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট

ভূ-রাজনীতির আলোচনায় ভৌগোলিক বৈশিষ্টই প্রাধান্য পায়। তাই এবার বাংলাদেশের মৌলিক কিছু ভৌগোলিক নির্দেশক আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল।এ দেশের তিন দিক ঘিরে (উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম) ভারতের সাথে ২৫৬৬ কি· মি· ব্যাপী সাধারণ সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কক্সবাজারের সাথে মায়ানমার-এর ১৭৬ কি· মি· ব্যাপী সাধারণ সীমা রয়েছে।[৪] বাংলাদেশের দক্ষিণে ৩১০ কি· মি· ব্যাপী বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিশাল সাধারণ সীমা এদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কেবল তিন দিকে ভূ-খন্ডগত সাধারণ সীমাই নয় বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় ব্লু ওয়াটার নেভীর শক্তিশালী অবস্থান কার্যতঃ বাংলাদেশকে ভূ-বেষ্টিত রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এর প্রধান তিনটি নদী হলো পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা। এ নদীগুলোর বাহিত পলি দ্বারাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ ভূ-খন্ডের দেশ বাংলাদেশের সৃষ্টি। বাংলাদেশ নিম্ন অঞ্চলের দেশ হওয়ায় এর উপর দিয়ে প্রবহমান নদীগুলোর মধ্যে ৫৪টি নদীই উজানের দেশ ভারত হতে এদেশে প্রবেশ করেছে। এ নদীগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভারত ইতোমধ্যেই গঙ্গা (বাংলাদেশে পদ্মা নামে অভিহিত) নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে।

জালের ন্যায় বিস্তৃত বাংলাদেশের নদীগুলো ভূমিকে দিয়েছে বিপুল উর্বরা শক্তি। পৃথিবীতে বাংলাদেশের মতো উর্বর ভূমি খুব কমই আছে যেখানে বীজ বপনের পর অতি সামান্য কিছু পরিচর্যার পরেই বিপুল পরিমাণ শস্য সম্ভার ঘরে তোলা সম্ভব। নদী গঠিত ভূ-খন্ড হওয়ায় বাংলাদেশ স্বভাবতঃই সমতল। দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্বাংশে ও উত্তর-পূর্বাংশে কিছু পার্বত্য অঞ্চল এবং মধ্য ভাগ ও উত্তর ও পশ্চিমে কিছু লাল কংকরময় ভূ-খন্ডও রয়েছে। এ পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে 'জুম চাষ' পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। অপরদিকে নদী বিধৌত সমভূমিতে প্রচলিত

৪· Nuruzzaman, Md. '*National Security of Bangladesh : Challenges and Options.*' BIISS Journal Vol-12, No-3, 1991, p-375

www.pathagar.com

সাধারণ চাষাবাদ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ শস্য উৎপাদন করে থাকে যদিও বাংলাদেশ খাদ্যে এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।

বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রাকৃতিক বৈরিতার কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অত্যন্ত আরামপ্রদ। এদেশ মৌসুমী বায়ুর দেশ হওয়ায় ঋতুবৈচিত্র এখানে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ছয়টি ঋতু (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত) এদেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। গ্রীষ্মের শুরুতে এবং বর্ষার শেষের সময়টা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ভীতিকর। এ সময়েই বাংলাদেশের উপর দিয়ে কখনো বয়ে যায় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়। এ ঝড়ে বাংলাদেশের দক্ষিণের দ্বীপগুলো ও সমুদ্র উপকূলবর্তী নীচু এলাকা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই কিছু না কিছু বন্যা হয়ে থাকে। কখনো কখনো তা অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের একার পক্ষে অধিকাংশ সময়ই এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য একটি স্থায়ী দুর্বলতার কারণ।

২. বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতায় সীমান্তসংলগ্ন দেশসমূহ

দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাথে সাধারণ সীমান্ত রয়েছে কেবল ভারত ও মায়ানমার-এর সাথে। বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত এবং দক্ষিণ পূর্বাংশের সামান্য সাধারণ সীমায় রয়েছে মায়ানমার। যে কোন দেশের ভূ-রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার সীমান্তবর্তী দেশসমূহ। বাংলাদেশের বেলায়ও তাই প্রযোজ্য। নিম্নে বাংলাদেশ-ভারত ও বাংলাদেশ-মায়ানমার ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা আলোচিত হলো।

২.১ বাংলাদেশ-ভারত

ভারতের সাথেই বাংলাদেশের সাধারণ সীমা বেশী থাকায় এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হচ্ছে ভারত। এ কারণে স্বভাবতঃই বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতের অবস্থান। ১৯৭১ সালে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালের কিছু সময়কে বাদ দিলে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ককে

www.pathagar.com

কোনভাবে ভালো বলা যায় না। বাংলাদেশের সাথে এর অনেকগুলো বিরোধপূর্ণ ইস্যু রয়েছে যা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মূলত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কোন বৃহৎ প্রতিবেশীর পাশে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অবস্থান করলে তাকে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশও তেমনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন যা কেবল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতেই নয়— অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি সমাজনীতিতেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। নিম্নে আমরা বিষয়টি চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করছি ঃ

১· আন্তর্জাতিক নদী সংক্রান্ত সমস্যা।
২· সমুদ্র সীমা সমস্যা।
৩· ছিটমহল সংক্রান্ত বিরোধ।
৪· 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন' ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা।

২.১.১ আন্তর্জাতিক নদী সংক্রান্ত সমস্যা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। জালের ন্যায় বিস্তৃত এ নদীসমূহের মোট দৈর্ঘ প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার এবং আয়তন প্রায় ৩·৪ মিলিয়ন একর, অর্থাৎ দেশের ৯·৭ শতাংশ জমির উপর দিয়ে এ নদীসমূহ প্রবহমান।[৫] বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল দেশের বাইরে বিশেষতঃ ভারতে। ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবহমান নদীর সংখ্যা ৫৪টি। (চিত্রঃ১) এদের মধ্যে প্রধান তিনটি নদী হলো গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা। এ নদীগুলোর রয়েছে বিপুল সংখ্যক শাখা-প্রশাখা। বর্ষকালে এ নদীগুলোতে বিপুল পরিমাণ পানির প্রবাহ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে তা দারুণভাবে কমে যায়। একের অধিক রাষ্ট্রের উপর দিয়ে প্রবহমান নদীকেই আন্তর্জাতিক নদী বলে। এ সংজ্ঞা মতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা আন্তর্জাতিক নদী। এদের মধ্যে গঙ্গা নদী চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত; ব্রহ্মপুত্র নদী চীন, ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত এবং মেঘনা নদী ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। এগুলো সারা বছরই প্রবহমান থাকে, কেবল সময়ভেদে পানি প্রবাহের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

৫· Nurul Islam Nazem and Mohammad Humayun Kabir, '*Indo-Bangladesh Common Rivers and Water Diplomacy*' BIISS Papers, No-5, December 1986. p-4.

www.pathagar.com

ভারত উজানের দেশ হওয়ায় বিশেষতঃ যখন বাংলাদেশে নদীসমূহের ৯২% প্রবাহ ভারত হতে আসে তখন এ পানি সম্পদের উপর তার নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বার্থের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। ভারত ইতোমধ্যেই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পানি সম্পদকে ব্যবহারের জন্য ৫৪টি ব্যারাজ, ড্যাম ও বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে যাদের মধ্যে ৩৮টিই হলো গঙ্গা অববাহিকার জন্য।[৬] গঙ্গা নদীর প্রকল্পসমূহ ছাড়াও ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় স্টোরেজ ড্যাম নির্মাণের জন্য ১৭টি স্থান নির্ধারণ করেছে।[৭] এদের মধ্যে অনেকগুলো প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে, যেমন— চম্বল নদীর উপর গান্ধীসাগর ও রানা প্রতাপ সাগর বাঁধ, যমুনা নদীর উপর মাতাতিলা বাঁধ; সোন নদীর উপর সোন বাঁধ, গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা ও জঙ্গিপুর বাঁধ ইত্যাদি। তাছাড়া আরো অনেক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ চলছে।

২.১.১ ক. গঙ্গা নদী ও ফারাক্কা

গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশে এর প্রবাহ হঠাৎ দারুণভাবে কমে যাওয়ায় তা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক কাঠামোতে এক মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছে। এ নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়ন চলছে দীর্ঘদিন থেকে। প্রথমেই গঙ্গা নদীর উৎস নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা যাক।

গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ২৩ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত গঙ্গোত্রী হিমবাহে। গঙ্গার উৎস থেকে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব এবং তারপর পূর্ব দিকে। ভারতের মধ্য দিয়ে প্রায় এক হাজার মাইল অতিক্রম করে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চীন, নেপাল ও ভারতের হিমালয় অঞ্চল থেকে গঙ্গার কয়েকটি উপনদী উত্তর দিক থেকে গঙ্গায় পড়েছে। ঐ উপনদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কার্ণালী, সপ্তকোশী, রামগঙ্গা, গোমতী, গন্ডক, ঘাঘারা, কুশী এবং বাগমতি। গঙ্গার আরেকটি বড় শাখা যমুনা গঙ্গার উৎসমুখ থেকে বেরিয়ে পাঁচশ' মাইল পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে

---

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১০।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১০।

www.pathagar.com

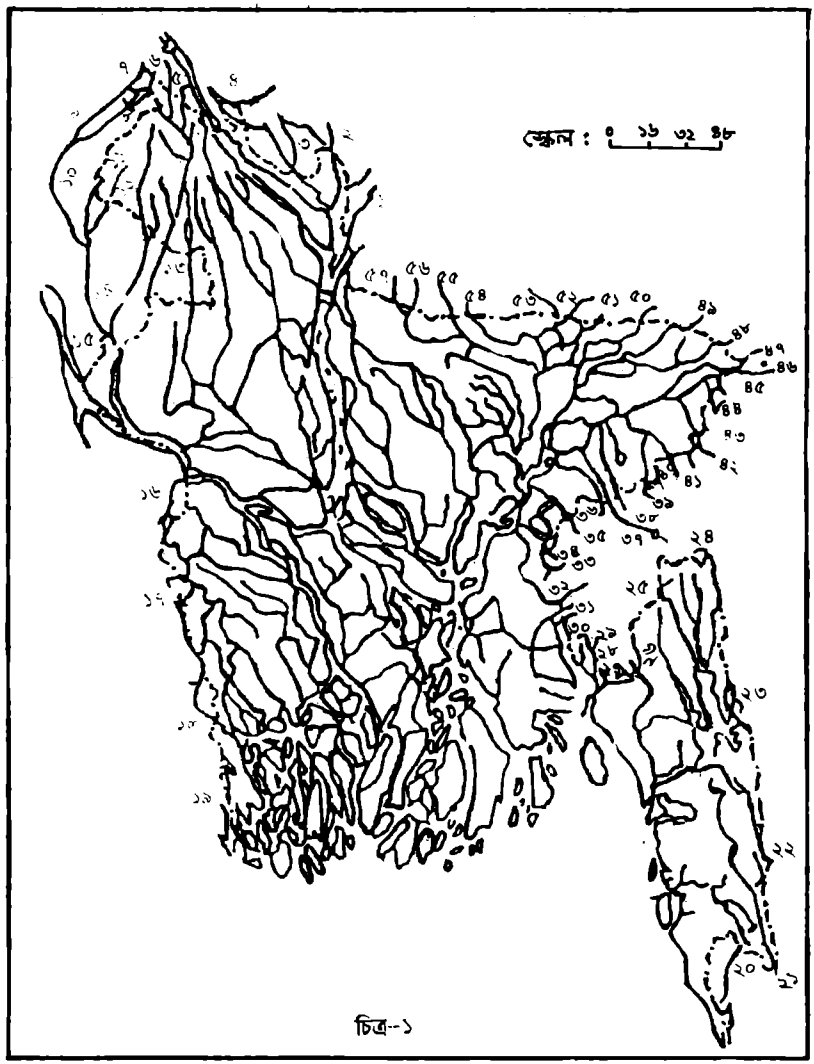

চিত্র--১

চিত্রে নির্দেশিত নদ নদী

১· ব্রহ্মপুত্র, ২· দুধকুমার, ৩· ধরিয়া, ৪· তিস্তা, ৫· খরখরিয়া যমুনেশ্বরী, ৬· তাল্‌মা, ৭· করতোয়া-আত্রাই, ৮· ডাহুক, ৯· মহানন্দা, ১০·

www.pathagar.com

নাগর, ১১· কোলিক, ১২· তাঙ্গো, ১৩· পুনর্ভবা, ১৪· পাগলা, ১৫· গঙ্গা, ১৬· মাথাভাঙ্গা, ১৭· কপোতাক্ষ, ১৮· ইছামতী-কালিন্দী, ১৯· রাইমঙ্গল, ২০· মাতামুহুরী, ২১· বাঁখিয়াং খাল, ২২· দিঘা বা কাউরপিন, ২৩· কর্ণফুলী, ২৪· কামালং, ২৫· মিয়ানী খাল, ২৬· হালদা, ২৭· ফেনী, ২৮· মুহুরী, ২৯· সেলুনিয়া, ৩০· ছোট ফেনী-ডাকাতিয়া, ৩১· গোমতী, ৩২· সালদা, ৩৩· বিজনী, ৩৪· হাওড়া, ৩৫· এন্ডারমান খাল, ৩৬· সোনাই, ৩৭· সুতাঙ, ৩৮· খোয়াই, ৩৯· কারাংগী, ৪০· লাংলা (গুপিয়ালাংলা), ৪১· ঢালাই, ৪২· মনু, ৪৩· জুরী, ৪৪· সোনাই-বারদাল, ৪৫· কুশিয়ারা, ৪৬· সুরমা-মেঘনা, ৪৭· সারী-গোয়াইন, ৪৮· পিয়ান, ৪৯· ধলা (ধলাই গাং), ৫০· উমিয়াম (বগরা), ৫১· নোয়াগঞ্জ, ৫২· ধামালিয়া, ৫৩· যদুকাটা, ৫৪· শামস্ওয়ারী, ৫৫· নিতাই, ৫৬· ভুগাই-কংশ, ৫৭· চিল্লাখালী।

দক্ষিণ দিকে এলাহাবাদের কাছে আবার গঙ্গায় মিশেছে। গঙ্গা রাজশাহী সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গঙ্গা অববাহিকায় বার্ষিক পানি প্রবাহের পরিমাণ ৩৫৯ মিলিয়ন একর ফুট। উজানে ভারত পানি ব্যবহারের পর ফারাক্কায় পানি প্রবাহের পরিমাণ থাকে ৩৭২ মিলিয়ন একর ফুট।[৮] বর্ষায় গঙ্গার পানি প্রবাহের ৭৩ শতাংশ ও শুষ্ক মৌসুমে ৪৩ শতাংশ আসে নেপাল থেকে।[৯]

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নিকটে ভারতের মুর্শিদাবাদ জিলার রাজমহল ও ভগবানগোলার নিকট গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ অবস্থিত। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণে ভারতের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভাগিরথী-হুগলী নদীর নাব্যতা এবং কোলকাতা বন্দরে নৌচলাচলের অধিক সুবিধা সৃষ্টি করা। গঙ্গা থেকে ভাগিরথী-হুগলী নদীতে পানি প্রত্যাহারের জন্য একটি ফিডার খাল নির্মাণ করা হয়। ভারত সরকার ১৯৬০ সালে ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্পটি অনুমোদন করে এবং এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে।

গঙ্গা নদীর বার্ষিক গড় প্রবাহ প্রায় এক লক্ষ কিউসেক যা উভয় দেশেরই প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট।[১০] কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ মৌসুম ভিত্তিক ওঠানামা

---

৮ বি, এম, আব্বাস এ, টি, *'ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ'*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ-১৮

৯· *প্রাগুক্ত।*

১০· BIISS Papers, No.-5, December 1986, p-12

www.pathagar.com

করে। গঙ্গার মোট প্রবাহ ৮০ শতাংশই জুলাই থেকে অক্টোবর—এ চার মাসের মধ্যে প্রবাহিত হয়। গাঙ্গেয় সমভূমিতে বার্ষিক ৮২ শতাংশ বৃষ্টিপাতও এই জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে থাকে।[১১] ফলে এ সময়ে গঙ্গার মৌসুমী প্রবাহ সবচেয়ে বেশী থাকে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় শুষ্ক মৌসুমে। এ সময়ে গঙ্গার পানির প্রবাহ খুব কম থাকে যা উভয় দেশেরই প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ সমস্যা আরো জটিল হয় ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্তের ১১ মাইল উজানে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করলে।

বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কিছু অংশ অর্থাৎ মোট এলাকার ৩৭ শতাংশই এবং ত্রিশ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী গঙ্গার পানির উপর নির্ভরশীল। গঙ্গার উপর নির্ভরশীল এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সবচেয়ে কম। পশ্চিমাংশের রাজশাহী হতে উপকূলের পটুয়াখালী পর্যন্ত বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০ ইঞ্চি হতে ১২০ ইঞ্চি-এর মধ্যে ওঠানামা করে।[১২] এ বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প। এ কারণে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের স্বার্থে প্রচুর পানি প্রয়োজন যা বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। বাংলাদেশের কৃষি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮০ শতাংশ, জনসংখ্যার মোট কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশ এবং মোট রপ্তানীর ৮০ শতাংশ সরবরাহ করে।[১৩] এমনিতেই শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কম থাকে। তার উপর 'ফারাক্কার' মাধ্যমে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে নেয়ায় বাংলাদেশের কৃষি আজ হুমকির সম্মুখীন।

ফারাক্কা সমস্যার সমাধানকল্পে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা ও বৈঠক হলেও আজো তার কোন সুস্পষ্ট সমাধান হয়নি। ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হলেও পানি বন্টন প্রশ্নটি কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হয়। ১৯৭৪ সালের মে মাসে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন কিন্তু গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ

---

১১. Nahid Islam, *'The Ganges Water Dispute : Environmental and Related Impacts on Bangladesh'*. BIISS Journal, Vol-12, No-3, 1991, p-272.

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৭৪।

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৭৪।

www.pathagar.com

হন। ১৯৭৫ সালে ১৬ই এপ্রিল ঢাকায় দু'দেশের মন্ত্রীরা ফিডার ক্যানেলের কার্যকারিতা পরীক্ষার ব্যাপারে আলোচনায় বসেন। সমঝোতা অনুসারে ২১ শে এপ্রিল থেকে ৩১ শে মে পর্যন্ত ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কার ফিডার ক্যানেলে দু'দেশের স্বীকৃত দশদিন মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি পরীক্ষামূলকভাবে গঙ্গা থেকে ভাগিরথী-হুগলী নদীতে প্রবাহিত করা হয়। সূচীটি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

সূচী ঃ ১ বাংলাদেশ-ভারত পানি বন্টন '৭৫ (কিউসেক হিসেবে)[১৪]

দশ দিনের একক	ফারাক্কায় মোট প্রবাহ	চুক্তিমতে হুগলীর প্রবাহ	বাংলাদেশেরজন্য অবশিষ্ট প্রবাহ
২১ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল	৫৫,০০০	১১,০০০	৪৪,০০০
১ মে হতে ১০ মে	৫৬,৫০০	১২,০০০	৪৫,০০০
১১ মে হতে ২০ মে	৫৯,২৫০	১৫,০০০	৪৪,২৫০
২১ মে হতে ৩১ মে	৬৫,৫০০	১৬,০০০	৪৯,৫০০

১৯৭৫ সালের জুন মাসে যৌথ নদী কমিশন তার অষ্টম বৈঠকে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির প্রশ্নে দু'দেশের বিপরীত প্রস্তাব সম্বলিত প্রতিবেদন পেশ করে। উভয় প্রস্তাবই উভয় দেশ নাকচ করে দেয়।

১) বাংলাদেশের প্রস্তাব

বাংলাদেশের প্রস্তাবে ভারত ও নেপালে ড্যাম্ নির্মাণ করে বর্ষা মৌসুমে তাতে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে সেই পানি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।[১৫] ভারত বাংলাদেশের প্রস্তাবকে এ অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে যে, যৌথ নদী কমিশন ভারত ও বাংলাদেশের একটি দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং তৃতীয় দেশ নেপালের সহযোগিতার বিষয় এতে আলোচনা করা যাবে না।

---

১৪. Government of Bangladesh, *'Crisis on the Ganges'* p-1, quoted in Istiaq Hossain. *'Bangladesh-India Relations : Issues and Problems'* in Emajuddin Ahamed (ed), *'Foreign Policy of Bangladesh'* , a small state's imperatives, Dhaka, 1984, p-41.

১৫. বি. এম আব্বাস এ. টি- *"ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ"* ইউ, পি, এল, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ-১৩৫।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সমীক্ষা অনুযায়ী, পাঁচ মাসের শুষ্ক মৌসুমে (জানুয়ারী-মে) ভারতের সেচ কাজের জন্য ৮৬ মিলিয়ন একর ফুট পানির প্রয়োজন। এ সময়ে বাংলাদেশ ও নেপালের আনুমানিক প্রয়োজন যথাক্রমে ৪৫ ও ২৩ মিলিয়ন একর ফুট। অর্থাৎ তিনটি দেশের মোট প্রয়োজন ১৫৪ মিলিয়ন একর ফুট। ভারতে গঙ্গা অববাহিকায় পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণের উপযুক্ত ৫১টি স্থান রয়েছে। এদের মধ্যে ২৯টি নির্মিত হয়েছে এবং ২২টি পরিকল্পনাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে নির্মিত সেচ প্রকল্প ও সংরক্ষণাগার থেকে ব্যবহৃত পানির পরিমাণ ৫৩ মিলিয়ন একর ফুট, ২২টি পরিকল্পনাধীন সংরক্ষণাগার থেকে পাওয়া যাবে ২৭ মিলিয়ন একর ফুট এবং ফারাক্কায় পানির প্রবাহ শুষ্ক মৌসুমে ২১ মিলিয়ন একর ফুট অর্থাৎ মোট ১০১ মিলিয়ন একর ফুট। এর সাথে নেপালে প্রস্তাবিত ৭টি সংরক্ষণাগার থেকে সম্ভাব্য ৫৭ মিলিয়ন একর ফুট যোগ দিলে গঙ্গা অববাহিকায় মোট ১৫৮ মিলিয়ন একর ফুট পানি পাওয়া যাবে যা শুষ্ক মৌসুমে তিন দেশের পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট।

বাংলাদেশের সমীক্ষা অনুযায়ী নেপালে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন উপনদীতে ৩১টি পানির আধার নির্মাণ করা সম্ভব হলেও বাংলাদেশের প্রস্তাবে এদের ৭টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৬] এগুলো হচ্ছে চিসাপানি, কালি গন্ডাকি-১, কালি গন্ডাকি-২, ত্রিশূল, গঙ্গা, সেতী, সপ্তকেশী ও পঞ্চেশ্বর (চিত্রঃ ২)। নেপালে প্রস্তাবিত পানির আধারের প্রাকৃতিক নদী-খাল দিয়ে প্রবাহিত করে গন্ডাকি এবং কোশি নদীর পানি নেপালের তরাই এলাকা বরাবর খাল খনন করে ভারতে ও বাংলাদেশে প্রবাহিত মহানন্দা, করতোয়া ও আত্রাই নদীতে প্রবাহিত করা যায়। এ পানি শুষ্ক মৌসুমে পশ্চিম বাংলার মহানন্দা ও বাংলাদেশের করতোয়া নদীর পানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। নেপালে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ৭টি ড্যাম্ থেকে ৫০০০ মেগাওয়াট হারে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব যার স্থাপিত ক্ষমতা হবে ১১,৫০০ মেগাওয়াট। এগুলো নির্মাণে আনুমানিক খরচ হিসেব করা হয়েছে ১৭,০০০ মিলিয়ন ডলার।[১৭]

---

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪১।

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩৬।

www.pathagar.com

১. আন্তর্জাতিক সীমারেখা
২. বাংলাদেশের প্রস্তাব ও প্রকল্পসমূহ
ক) প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য নেপালে ৭টি ড্যাম (প্রস্তাবিত)
খ) বাহাদুরাবাদে ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ (প্রস্তাবিত)
গ) হার্ডিঞ্জ সেতুতে গঙ্গা ব্যারাজ (প্রস্তাবিত)
ঘ) ভৈরব বাজারে মেঘনা ব্যারাজ (প্রস্তাবিত)
ঙ) ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ (নির্মাণাধীন)
৩. ভারতীয় প্রস্তাব এবং প্রকল্পসমূহ-
ক) ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল (প্রস্তাবিত)
খ) জগিগোপায় ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ (প্রস্তাবিত)
গ) ব্রহ্মপুত্রে দু'টি ড্যাম ও টিপাইমুখের তীরে একটি ড্যাম (প্রস্তাবিত)
ঘ) গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ
ঙ) গজলডোবায় তিস্তা ব্যারাজ
নেপাল
ভারত
বিহার
গঙ্গা
ফারাক্কা
পশ্চিম বাংলা
কোলকাতা
সিকিম
আসাম
মেঘালয়
দিহাং ড্যাম
সুবনসিরি ড্যাম
টিপাইমুখ ড্যাম
বঙ্গোপসাগর
স্কেল
১:৪০০০,০০০

২) ভারতের প্রস্তাব

ব্রহ্মপুত্রের পানি গঙ্গায় প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে সংযোগ খালের ভারতীয় প্রস্তাব বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেয়। প্রস্তাব অনুসারে আসামের জগিগোপাতে ব্রহ্মপুত্রের উপর একটি ব্যারাজ নির্মাণ দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ফারাক্কার উজানে গঙ্গাতে নিয়ে আসা হবে।[১৮] প্রস্তাবে খালটি হবে ২০০ মাইল দীর্ঘ (৩২০ কি· মি·) যার তিন ভাগের একভাগ পড়বে বাংলাদেশে। খালের গভীরতা হবে ৩০ ফুট এবং প্রস্থ হবে আধা মাইল। এ খাল দিয়ে ব্রহ্মপুত্র থেকে এক লক্ষ কিউসেক পানি প্রবাহিত করা হবে গঙ্গায় ফারাক্কার উজানে। ভারতীয় প্রস্তাবের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর দুটি শাখা নদী দিহাং ও সুবনসিরিতে দুটো উঁচু বাঁধ এবং বরাক নদীতে আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করা হবে (চিত্রঃ২)। ভারতের হিসেব মতে, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট খরচ হবে ১২৫০০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ হিসেবে বৈদ্যুতিক যোগাযোগের সরঞ্জামাদি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ অন্যান্য খাল এবং নৌ চলাচল খরচ ধরা হয়নি। বাংলাদেশের সমীক্ষকরা মনে করেন এসব খরচসহ প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ৩৩,০০০ মিলিয়ন ডলার।[১৯]

ভারতের এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতের অভ্যন্তরেই বিরূপ মত রয়েছে। আসামে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আসাম ইন্‌স্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এ পরিকল্পনার উপর মন্তব্য করেছে—'শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ তার নিজের অববাহিকার জন্য পর্যাপ্ত নয়; অন্য অববাহিকার জন্য এ নদীর পানি স্থানান্তরের প্রশ্নই ওঠে না।'[২০] এ ছাড়াও সংস্থার মতে ভারতের ব্রহ্মপুত্রের উপরে উচ্চ বাঁধ নির্মাণ প্রস্তাবের কার্যকারিতা সন্দেহজনক কেননা এ অঞ্চল ভূমিকম্পের আওতাধীন। বাংলাদেশের বিশ্লেষকগণ মনে করেন এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উত্তরাঞ্চলের অনেকগুলো নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

মূলতঃ দ্বিপাক্ষিকতার অজুহাতে ভারত বাংলাদেশের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে আলাদাভাবে ভারত–নেপাল এবং ভারত–বাংলাদেশ আলোচনার মাধ্যমে

১৮· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩৭।

১৯· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩৭।

২০· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩৯।

www.pathagar.com

সর্বাধিক লাভ আদায় করতে চায়। ভারত শুষ্ক মৌসুমে নিজের দেশের গঙ্গার প্রবাহ, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বর্তমানে প্রবাহিত পানি এবং নেপালের বিভিন্ন পানির আধারে সংরক্ষিত পানির সবটাই তার নিজের ব্যবহারে লাগাতে চায়। ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাবের আরেকটি লক্ষ্য হলো– ভারতের পূর্বাঞ্চল হতে পশ্চিমাঞ্চলে সংযোগকারী নদীপথ প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা।[২১] চীনের চুম্বী উপত্যকার অতি নিকটে অবস্থিত মাত্র চৌদ্দ মাইলের সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডোরটি কৌশলগত দিক থেকে অরক্ষিত হওয়ায়, ভারত তার উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগকে অধিকতর নিশ্চিত করার জন্যেই মূলতঃ এ সংযোগ খালের প্রস্তাব দিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব একটি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে।

ভারতে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে এমনি ক্রমাগত নিষ্ফল আলোচনা চলছিল। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজী দেশাই এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন অটল বিহারী বাজপেয়ী। এ বছর ঢাকায় ১৮ই এপ্রিল দুই সরকারের মধ্যে সবচেয়ে শুকনোর সময় পানির বন্টন নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের ৫ই নভেম্বর ৫ বছর মেয়াদী একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি মন্ত্রী পর্যায়ে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিমতে, ফারাক্কায় উষ্ণ মৌসুমের প্রবাহের ৫৫,০০০ কিউসেক পানির মধ্যে বাংলাদেশ পাবে ৩৪,৫০০ কিউসেক এবং ভারত পাবে ২০,৫০০ কিউসেক (সূচী ঃ ২)।[২২] চুক্তিতে একটি নিশ্চয়তার ধারা (Guarantee Clause)ছিল যে, যদি ফারাক্কায় পানির প্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায় তবুও বাংলাদেশ তার প্রাপ্যের ৮০ শতাংশ পাবে।[২৩]

---

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪০।

২২. Nahid Islam, *"The Ganges Water Dispute : Environmental and Related Impacts on Bangladesh"*, BIISS Journal, Vol-12, No-3, 1991, p-275.

২৩. *Indo-Bangladesh Agreement on Sharing of Ganges waters at Farakka*, Dacca, November 5, 1977, Article (II), placed in Dr. S. S. Bindra, *Indo-Bangladesh Relations*, New Delhi, 1982, Appendix (v), p-166.

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালের গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১৯৮২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে। ভারতে ইতোমধ্যেই সরকার পরিবর্তন হয়ে পুনরায় কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হলে ভারত সরকার এ চুক্তির নবায়নে রাজী হয়নি। এর পরিবর্তে ১৯৮২ সালের ৭ই অক্টোবর দিল্লীতে দু' দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ১৮ মসের জন্য। এই সমঝোতা স্মারকে পূর্বের চুক্তির কিছু পরিবর্তন করা হয়। পানি বন্টনের পরিমাণ মোটামুটি আগের মতো থাকলেও নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে বাংলাদেশের ভাগের ৮০ শতাংশের যে প্রাক গ্যারান্টি ছিল তা বাদ দেয়া হয়।[২৪] এর ফলে ফারাক্কার উজানে ভারত কর্তৃক গঙ্গার পানি যথেচ্ছ ব্যবহারে চুক্তিগত বাধা দূর হয় এবং ফারাক্কায় গঙ্গার পানি প্রবাহ একেবারে কমে গেলেও বাংলাদেশের কিছুই বলার থাকবে না।

১৯৮২ সালের সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ১৯৮৪ সালের ৩১ শে মে তারিখে শেষ হয়ে যায়। বাংলাদেশের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত এর নবায়নে রাজী হয়নি। ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে বাহামার রাজধানী নাসাউতে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলনে অংশগ্রহণকালে বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার প্রধানদ্বয় গঙ্গার ও অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিন বছরের জন্য আরেকটি সমঝোতা স্মারকে সম্মত হন।

১৯৮৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী কাঠমুন্ডুতে সার্ক সচিবালয়ের উদ্বোধনের সময় ভারত ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয় নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে গঙ্গার পানি নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু এ বৈঠকে ভারত হিমালয়ের পানি সম্পদ উন্নয়নের একটি কর্মসূচী দিতে ব্যর্থ হওয়ায় কোন কার্যকর আলোচনা হয়নি।

২.১.১ খ. ব্রহ্মপুত্র নদী

ব্রহ্মপুত্র বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহত্তম নদী যার দৈর্ঘ প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার। এ নদী চীন, ভারত, ভুটান বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। এর

২৪· বি. এম· আব্বাস এ. টি· '*ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ*', ইউ, পি এল, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ-৯।

www.pathagar.com

মোট অববাহিকার আয়তন প্রায় ৬০৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।[২৫] বাংলাদেশ এ নদীর উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল, বিশেষত ঃ

সূচী ঃ ২:১৯৭৭-এর চুক্তি অনুযায়ী শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় পানির প্রবাহ বন্টন (কিউসেক হিসেবে)

সময়কাল		ফারাক্কায় পানির মোট প্রবাহ (কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ)	ফারাক্কায় ভারত কর্তৃক পানি প্রত্যাহারের পরিমাণ	বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির প্রবাহ
জানুয়ারী	১-১০	৯৮৫০০	৪০০০০	৫৮৫০০
	১১-২০	৮৯৭৫০	৩৮৫০০	৫১২৫০
	২১-৩১	৮২৫০০	৩৫০০০	৪৭৫০০
ফেব্রুয়ারী	১-১০	৭৯২৫০	৩৩০০০	৪৬২৫০
	১১-২০	৭৪০০০	৩১৫০০	৪২৫০০
	২১-২৮/২৯	৭০০০০	৩০৭৫০	৩৯২৫০
মার্চ	১-১০	৬৫২৫০	২৬৭৫০	৩৮৫০০
	১১-২০	৬৩৫০০	২৫৫০০	৩৮০০০
	২১-৩১	৬১০০০	২৫০০০	৩৬০০০
এপ্রিল	১-১০	৫৯০০০	২৪০০০	৩৫০০০
	১১-২০	৫৫৫০০	২০৭৫০	৩৪৭৫০
	২১-৩০	৫৫০০০	২০৫০০	৩৪৫০০
মে	১-১০	৫৬৫০০	২১৫০০	৩৫০০০
	১১-২০	৫৯২৫০	২৪৭০০	৩৫২৫০
	২১-৩১	৬৫৫০০	২৬৭৫০	৩৮৭৫০

উৎস ঃ S. S Bindra, Indo-Bangladesh Relations, New Delhi, 1982. P-102

কৃষি, লবণাক্ততা রোধ, পরিবহন ও নৌ চলাচল, মৎস্য আহরণ ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য।

২৫. *প্রাগুক্ত*, BIISS Papers, No-5, December 1986, p-18.

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হিমালয়ের কৈলাশ গিরিশৃঙ্গের হিমবাহে। চীনের তিব্বত অঞ্চলে নদীটি সাংগো নামে সাত শত মাইল প্রবাহিত হয়েছে। কয়েকটি উপনদীর পানি বহন করে নদীটি হঠাৎ মোড় ঘুরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁধ নিয়ে পাহাড় শৃঙ্গ পেরিয়ে নতুন নাম দিহাং নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। পরে দু'টি বড় উপনদী দিবাং এবং লৌহিত মূল নদীর সাথে মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হয়েছে। উত্তর দিক থেকে কয়েকটি উপনদী সুবর্ণসিড়ি, কাসেং এবং মানস, দক্ষিণ দিক থেকে বুরি বিহাং, দিমাংগ, দিথো ধামসী এবং ধানসিড়ি ব্রহ্মপুত্রে এসে পড়েছে। প্রায় ৪৫০ মাইল পথ আসাম উপত্যকার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র গোয়ালাপাড়ার নিকট গারো পাহাড়ের পশ্চিম দিকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের পর ১২২ মাইল দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র গোয়ালন্দের কাছে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। এ দুই নদীর মিলিত স্রোত পদ্মা নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে যমুনা নামে পরিচিত, যার বার্ষিক পানি প্রবাহের পরিমাণ ৪৯২ মিলিয়ন একর ফুট।[২৬] ব্রহ্মপুত্রের উজানে ভারতের একতরফাভাবে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ভাটির দেশ বাংলাদেশের অর্থনীতিক এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য এক বিরাট হুমকি।

ভারত বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে আসাম অঞ্চলকে রক্ষার জন্য অনেকগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী হাতে নেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মূল নদীর শাখা নদীগুলোতে ৩৮৩০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ৭৭০ কিলোমিটার খাল খনন এবং ৪৪টি শহর রক্ষা প্রকল্প।[২৭] ইতিমধ্যেই অনেকগুলোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ অববাহিকায় কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৭·৭ মিলিয়ন একর, যার ১·৫ মিলিয়ন একর বর্তমানে সেচের আওতায় আনা হয়েছে এবং বাকী ৪·২ মিলিয়ন একর ভবিষৎ সেচের জন্য সম্ভাবনাময়।[২৮] ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী সে ব্রহ্মপুত্র হতে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ কিউসেক পানি প্রত্যহার করবে।[২৯] ভারতের এ জাতীয় পদক্ষেপের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই

২৬· বি. এম· আব্বাস এ. টি·, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৯।

২৭· *BIISS Papers*, No-5, December 1986, p-19.

২৮· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৯।

২৯· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৯।

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এক সময় তা বাংলাদেশের জন্যে বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে।

২.১.১ গ. তিস্তা নদী

বাংলাদেশের উত্তরের জিলাসমূহের সর্বাধিক গরুত্বপূর্ণ নদী তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী। তিস্তার উৎপত্তি উত্তর সিকিমে হিমালয় পর্বতে, প্রায় ২১,০০০ ফুট উচ্চতায়। পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীটি সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি জিলার সেভকের নিকট। তারপর বাংলাদেশের চিলমারিতে এসে নদীটি ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীতে পড়েছে। তিস্তার বার্ষিক গড় পানি প্রবাহের পরিমাণ ২৪৫০০ কিউসেক ও শুকনো মৌসুমে গড় প্রবাহ ৭৭১০ কিউসেক।[৩০]

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সেচ ব্যবস্থার জন্য তিস্তা নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি অনুধাবন করেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮-৫৯ সালে তিস্তায় একটি ব্যারাজ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পে ১·৪ মিলিয়ন একর ভূমিতে সেচ সুবিধা প্রদান এবং ১·৯ মিলিয়ন একর জমির শস্যকে ক্ষতি থেকে রক্ষার কথা বলা হয়।[৩১] কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারত নদীটির উজানে গজলদোবায় বাঁধ নির্মাণ করেছে। ফলে বাংলাদেশের নির্মাণাধীন তিস্তা ব্যারাজ হুমকির সম্মুখীন। ভারতীয় 'তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প' তিস্তার সমগ্র প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে। এতে বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পের অধীন অঞ্চল প্রয়োজনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পানি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই ভারতের এ প্রকল্পের বিরোধিতা করে এসেছে। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে দু'দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে একটি সমঝোতা হয়। এতে স্থিরীকৃত হয় যে, তিস্তার পানির ৩৬ শতাংশ পাবে বাংলাদেশ, ৩৯ শতাংশ পাবে ভারত ও ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে যা পরবর্তী সমীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ রকম একটি অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তিস্তার পানি প্রবাহের পরিমাণ কত ও কোন্ জায়গায় দু'দেশের মধ্যে বন্টিত হবে তার কোন সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি।

৩০· বি. এম আব্বাস এ. টি· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪৩।

৩১· *প্রাগুক্ত*, BIISS Papers, No-5, December 1986. p-19.

www.pathagar.com

২.১.১ ঘ. অন্যান্য নদীসমূহ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশে অনেক সীমান্তবর্তী ও সাধারণ নদী রয়েছে। এদের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ। এ নদীগুলো বাংলাদেশের মোট প্রবাহের ১৫ শতাংশ পূরণ করে। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য এগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ভারত এসব ছোট ছোট নদীর পানি নিয়ন্ত্রণের জন্যেও বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভারত বুরি তিস্তা, খেরুয়া, সাংলী এবং ঘোরামারা নদীতে ক্রস্ ড্যাম্ (Cross Dam) নির্মাণ করেছে। সে কালজানি, ধোলাই ও কাটাছড়া নদীতে স্পার (Spur) নির্মাণ করেছে এবং খাঁচায় আবদ্ধ ইট ফেলে যাচ্ছে। মনু ও চিড়ি নদীতে ইমবাংকমেন্ট তৈরী করেছে; খোয়াই ও গোমতী নদীতে ব্যারাজ নির্মাণসহ অন্যান্য নদীতে বিভিন্ন ধরনের পানি প্রত্যাহারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[৩২] এতে বাংলাদেশের জানমাল বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

i) কুশিয়ারা নদী

সর্পিলাকৃতির কুশিয়ারা নদী জাকিগঞ্জের নিকট বাংলাদেশের সীমান্ত রেখা নির্ধারক হিসেবে কাজ করছে। এখানে অন্য তীর ভারতের করিমগঞ্জে ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারত প্রায় ২৭টি কাঠের গুড়ি স্পার নির্মাণ করে।[৩৩] ফলে বাংলাদেশের নদীতীর প্রচন্ড ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্বরূপ ৩টি পাথর সজ্জিত মাটির গ্রোয়েন নির্মাণ করে। বিষয়টি নিয়ে ভারতের সাথে ক্রমাগত আলোচনাতেও কোন ফল হয়নি। ১৯৮১ সালে ভারত তার প্রধান গ্রোয়েনের নীচ থেকে ২০০ ফুট ভাটি পর্যন্ত খাঁচায় করে পাথর ও বোল্ডার স্তূপীকৃত করে।[৩৪] ১৯৮৩-৮৪ সালে স্থানীয় কমিটির দু'টো বৈঠকে সমঝোতায় পৌছলেও আজো তা বাস্তবায়িত হয়নি।

ii) মুহুরী নদী

ভারতের বেলুনিয়া শহরকে বামতীরে রেখে নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে

৩২· *প্রাগুক্ত*, পৃ-২০।

৩৩· বি. এম· আব্বাস এ. টি *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪৯।

৩৪· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪৯।

www.pathagar.com

ফেনী জিলার পরশুরাম উপজিলায়। এ জায়গায় নদীটি দু' দেশের সীমানা নির্ধারক হয়ে আছে। ভারত বেলুনিয়া তীর বরাবর ৯টি স্পার ও রিভেটমেন্ট তৈরী করায় বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ প্রবল ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছে। প্রায় ২০০ একরের মুহুরীর চর স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় নদী রক্ষা ব্যবস্থার ফলে নদীটি ভেঙ্গে বাংলাদেশের দিকে চলে আসছে এবং ভারতের দিকে চর সম্প্রসারিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারত এসব চরের একাংশে চাষাবাদ করা ছাড়াও শ্মশান নির্মাণ ও বাংকার তৈরী করেছে।[৩৫] বিষয়টি ভারতের দৃষ্টিতে আনলেও ভারত এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি।

iii) **ফেনী নদী**

রামগড়ের নিকট নদীটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নির্ধারণ করেছে। নদীর উভয় পাড়ে দু'দেশই স্পার নির্মাণ করে নদী প্রতিরক্ষার নামে। কিন্তু সম্প্রতি ভারত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করলে রামগড় থানা ও 'টি এস্টেট' (Tea Estate) ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। বিষয়টি যৌথ নদী কমিশনে আলোচিত হলেও এখনো তা অমীমাংসিত। একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে খোয়াই, ইছামতি ও গোমতী নদীর ক্ষেত্রে। কোদালিয়া নদীতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ১৯৭৬ সালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ১০০-১২৫ ফুট ভেতরে শুচিয়া গ্রামের নিকট আড়াআড়িভাবে চার ফোকরের ৩৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট স্লুইস গেট নির্মাণ করে। ভারত শুষ্ক মৌসুমে পানি আটকিয়ে সেচ কাজে ব্যবহার করে ও বর্ষার মৌসুমে অতিবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে পানির চাপ বৃদ্ধি পেলে হঠাৎ পানি ছেড়ে দেয়। এ কারণে এখানকার ৩০ বর্গমাইল এলাকা শুষ্কতা ও বন্যার শিকার হয়।

২.১.১ ঙ. নদী সমস্যায় বাংলাদেশের উপর প্রভাব

ক) পরিবেশ

বন্যা (Flood)

বন উজাড় ও উচ্চ অঞ্চলের বরফগলা ছাড়াও বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁধ নির্মাণ করে পলিমুক্ত পানি

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪৮।

www.pathagar.com

উজানে ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ পলিযুক্ত পানি ভাটির জন্য ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের নদীগুলোর নদীবক্ষ উঁচু হয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এতে বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত পানি কূল উপচে বন্যার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের ৩০ শতাংশ অঞ্চল বড় নদীগুলো এবং ৪০ শতাংশ অঞ্চল ছোট নদীগুলোর কূল উপচানো পানির কারণে বন্যার শিকার হয় (অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ উঁচু অঞ্চল হওয়ায় সব সময় বন্যা মুক্ত থাকে।)[৩৬] এক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতি বছর বন্যার কারণে শস্য ও সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০০০ মিলিয়ন টাকা।[৩৭]

নদীর গতিপথে পরিবর্তন

প্রধান নদীগুলো প্রতিবছর ২·৪ বিলিয়ন (প্রায়) টন পলি বহন করে থাকে।

চিত্র-৩

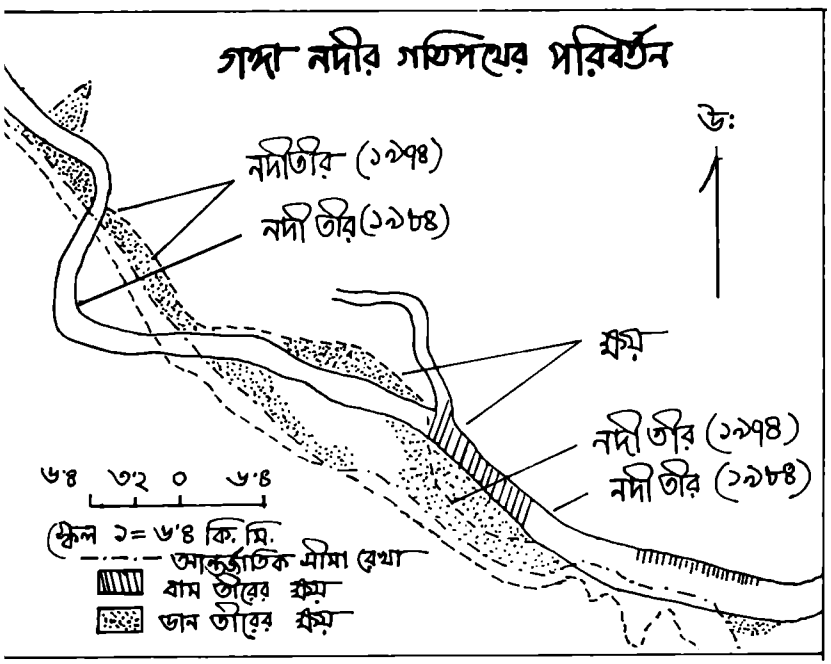

উৎস : The Bangladesh Times, 30 December, 1985

www.pathagar.com

উজানে পলিমুক্ত পানি প্রত্যাহার করে এ বিপুল পরিমাণ পলিযুক্ত পানি ভাটিতে ছেড়ে দেয়ায় নদীর গতিপথেরও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিল সীমানা নির্ধারণী ও অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। ফারাক্কা বাঁধ তৈরীর পর হতে বিগত বছরগুলোতে গঙ্গা তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে গঙ্গার প্রবেশ পথ ছিল একটি, কিন্তু বর্তমানে তা ১২ কি· মি· ভারতীয় ভূ-খন্ড ঘুরে দু'টি পথে প্রবেশ করেছে।[৩৮]

মরুময়তা (Desertification)

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হওয়ায় কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় পানির জন্য নদীর প্রবাহের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু উজানে বাঁধ দিয়ে ভারত পানি প্রত্যাহার করে নেয়ায় এ অঞ্চল প্রয়োজনীয় পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে এ অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলের ২১টি জিলার ৪০ শতাংশ জমি মারাত্মক লবণাক্ততার শিকার। বিশেষজ্ঞদের মতে উত্তর-পশ্চিমের ২১টি জিলার প্রায় ১·২ কোটি একর কৃষিযোগ্য জমি ক্রমান্বয়ে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে।[৩৯] এসব জমির ক্রম নিম্ন আর্দ্রতা ভবিষ্যৎ মরুময়তার ইঙ্গিতবহ। '৭৫-এর পূর্বে এ সমস্ত অঞ্চলের শুষ্কতম মাস এপ্রিল ও মে-এর আর্দ্রতার পরিমাণ বর্তমানে ফেব্রুয়ারীতেই পরিদৃষ্ট হয়।[৪০] ফলে বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা এবং বরিশাল জিলার রবিশস্যের উৎপাদন কমে গেছে। পদ্মা, মহানন্দা, পুনর্ভবা এবং পাগলা নদীর ১২৩ মাইলের ২৭ মাইল চর পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।[৪১] ফলে স্থানীয় নৌ চলাচলও আজ অসুবিধার সম্মুখীন।

৩৬· Md. M. Huda and J. U, Chowdhury. *'Flood and Erosion'* : Paper presented at a regional conference on Floods and Erosion, Dhaka 7-10, September 1989, placed Nahid Islam, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৭৭।

৩৭· Manirul Qader Mirza, *Holiday*, 4 July, 1986, cited in BIISS Papers, No-5, December 1986, p-31.

৩৮· *The Bangladesh Time*, 30 April,1985, BIISS Papers; (*প্রাগুক্ত*, পৃ-৩২)

৩৯· *Bangladesh Observer*, November 7,1989.

৪০· *প্রাগুক্ত*,

৪১· শামসুল ইসলাম টুকু, *দৈনিকসংবাদ*, ২৫এপ্রিল, ১৯৮৮।

www.pathagar.com

নদীবক্ষে বড় বড় চর পড়ে যাওয়ায় রাজশাহী জিলায় মাঝে মাঝে মারাত্মক ধূলিঝড় দেখা দেয় যা এ অঞ্চলের জন জীবনকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

লবণাক্ততা (Salinity)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ততা উজানে (ভারতে) নির্মিত বাঁধের আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব। লবণাক্ততা দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালীর প্রয়োজন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যে এক বিরাট নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন নদীর শক্তিশালী স্রোত। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা, গড়াই-মধুমতি নদীর প্রবাহ এত কম থাকে যে তা উপকূলের লবণাক্ততা রোধের জন্য যথেষ্ট নয়। ১৯৬৮ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট পানির প্রবাহ ৫৮,৮০০ কিউসেক থাকাকালে পশুর নদীর লবণাক্ততা ছিল প্রতি সেন্টিমিটারে ১০০০ মাইক্রোমোস (Micromhos)। ১৯৭৬ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট পানির প্রবাহ ২৩২০০ কিউসেক নেমে আসলে উপকূলে লবণাক্ততা ছিল ১,৩৬,০০০ মাইক্রোমোস। ১৯৮২ সালে পানির প্রবাহ ৩১৪০০০ কিউসেক হলে লবণাক্ততা ১১৫০০ মাইক্রোমোসে নেমে আসে।[৪২] সহনীয় মাত্রায় লবণাক্ততা (৫০০ মাইক্রোমোসের নীচে) রাখতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট পানির প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ২৮,০০০ ঘনফুট থাকতে হবে।[৪৩] পশুর ও শিবসা নদীতে এপ্রিল ও মে মাসে লবণাক্ততার পরিমাণ সর্বাধিক থাকে। ১৯৮৩ সালে ৫০০ মাইক্রোমোস লবণাক্ততা সম্পন্ন অঞ্চলের পরিমাণ ছিল ২৭,৬০০ বর্গ কি· মি।[৪৪]

৪২· Nahid Islam, প্রাগুক্ত, BIISS Journal. Vol-12, No- 3, পৃ-২৭৯।

৪৩· *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৭৯

৪৪· Ainun Nishat and Shahjahan Kabir Chowdhury, *'Water resources policy for Asia'*, a paper presented at a regional simposium on Water Resources Policy in Agro-Socio-Eonomic Development, Dhaka, 4-8 August, 1985. cited in Nahid Islam, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৮০।

www.pathagar.com

বন (Forest)

বিশ্বের একমাত্র বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বনভূমি সুন্দরবন বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গঙ্গা অববাহিকার উপর অবস্থিত। গঙ্গার পানি উজানে প্রত্যাহার করে নেয়ায় এ বনভূমি ক্রমশঃ উজাড় হতে চলেছে। কেননা শাখা নদীগুলোতে পানির প্রবাহ কম থাকায় এ অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রায়শই খরা দেখা দিচ্ছে যা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের প্রজননের জন্য এক বিরাট সমস্যা। শিবসা ও পশুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মূল্যবান সুন্দরী গাছ এ কারণে ধ্বংস হয়ে যচ্ছে।[৪৫] অথচ এ সুন্দরী গাছের জন্যেই এক সময় এ বনভূমির নাম হয়েছিলসুন্দরবন।

খ) অর্থনীতি

নদীর স্বল্প প্রবাহ, জমাকৃত পলি, ভূমিক্ষয়, লবণাক্ততা প্রভৃতি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এদেশের কৃষি, শিল্প, নৌ চলাচল, মৎস্য প্রভৃতি প্রতিবছর মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট চাষকৃত ৬·৮৫ মিলিয়ন একর জমির ১·৫৭ একর জমি আংশিক বা পুরোপুরি এ ক্ষতির শিকার।[৪৬] ১৯৭৬ সালের হিসেবে দেখা যায় কেবল চালের ঘাটতির পরিমাণ ২৩৬০০০ টন যা বাংলাদেশের মোট খাদ্য আমদানীর ২০ শতাংশ।[৪৭] ১৯৮৮-৮৯ সালে পানির সরবরাহের স্বল্পতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ছিল ৩৮৪৪৯ হেক্টর।[৪৮] ১৯৮৮-৮৯ সালে

৪৫· Nahid Islam, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৮১।

৪৬· A. Hannan, *'Impact of reduced low flow of the Ganges'*, a paper presented at a seminer organised by Department of Water Resources Engineering, BUET. August 23, 1980, p-11, cited in Nahid Islam, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৮১।

৪৭· Government of the Peoples Republic of Bangladesh, *'White paper on Ganges Dispute'*, September, 1976, p-8, cited in Nahid Islam, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৮১।

৪৮· Nahid Islam. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৮২।

www.pathagar.com

লবণাক্ততার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পরিমাণ ৪৩২৫৪ হেক্টর (গত বছর যা ছিল ৮২১৮ হেক্টর)। গঙ্গার উপর নির্ভরশীলতা থেকে ১৯৮৮-৮৯ সালে মোট অর্থনীতিক ক্ষতির পরিমাণ ২৮৯৫ মিলিয়ন টাকা বা ৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪৯]

উজানে বাঁধ দিয়ে পলিমুক্ত পানি ব্যবহার করে ভাটিতে বিপুল পরিমাণ পলিযুক্ত পানি সরবরাহের ফলে বাংলাদেশের নদীবক্ষ উঁচু হয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ হারাচ্ছে। এতে বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে প্রায় প্রতি বছরই কূল ছাপানো পানিতে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৮৮ সালের বন্যায় এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ছিল ২,৪০,৯২৯ হেক্টর।[৫০] একই কারণে শুকনো মৌসুমে দেখা দেয় খরা। ১৯৭৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত খরায় ক্ষতির পরিমাণ ২০,৭১১ মিলিয়ন টাকা।[৫১]

পানির স্তর খুব নীচে নেমে যাওয়ায় ভেড়ামারার গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে নতুন করে অভ্যন্তরীণ চ্যানেল খনন করতে হয়েছিল। এ বাবদ খরচ হয়েছিলো ১০ মিলিয়ন টাকা।

বিপুল পরিমাণ পলিযুক্ত স্বল্প প্রবাহ হেতু গড়াই নদী প্রতি বছরই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং প্রতি বছরই খনন করতে হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে এ জন্য ১৫ মিলিয়ন টাকা খরচ করা হয়েছিলো।

নদীগুলোর স্বল্প প্রবাহ মাছের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে এবং সেইসাথে পানির গভীরতা কমে যাওয়া ও লবণাক্ততা বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে হুমকির সম্মুখীন করছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক শিল্প কারখানাও বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন। পানির স্বল্প প্রবাহের কারণে গোলাপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। কিছুদিন পর আবার তাতে উৎপাদন শুরু করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিলো।[৫২]

এক সমীক্ষা মতে, লবণাক্ততার কারণে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট ক্ষতির

---

৪৯. *প্রাগুক্ত।*

৫০. *প্রাগুক্ত।*

৫১. *প্রাগুক্ত।*

www.pathagar.com

পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন টাকা।[৫৩] এসব কারণে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলও তার উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র অর্ধেক পরিমাণ উৎপাদন করে থাকে।

নদীবক্ষ উঁচু হয়ে যাওয়ায় তা অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচলে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করছে। যার ফলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল সংস্থাকে বাধ্য হয়ে প্রতি বছরই নৌ-রুটগুলো খনন করতে হয় এবং বারংবার ফেরীঘাট তৈরী করতে হয়। এ বাবদ বাংলাদেশকে একটি বিরাট অংক ব্যয় করতে হয়।

সূচীঃ ৩ ফেরীঘাট তৈরী ও ব্যবস্থাপনা খরচ ১৯৮৮-৮৯[৫৪]

ফেরী ঘাটের নাম	খরচের পরিমাণ (মিলিয়ন) টাকা
১· আরিচা	১·৬৬
২· নগরবাড়ী	·৭৪
৩· দৌলদিয়া	·৮২

উৎসঃ BIISS Journal VO-12. No-3

২.১.১ চ. ভারতের পানি বিষয়ক কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক পানি ব্যবহারের আইনগত দিক

আন্তর্জাতিক নদীর পানি নদী- অববাহিকার রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ সম্পত্তি। সে কারণেই এ সম্পদের উপর অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং যৌক্তিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বও তাই অপরিসীম। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আইন এখনো আইনরূপে পরিপক্কতা লাভ না করলেও ইতোমধ্যেই কিছু কিছু প্রথাগত বিধি বিধান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক পরিবারের সদস্য হিসেবে এগুলো সব রাষ্ট্রেরই মেনে চলা উচিত। ভারতীয় পানি বিষয়ক কার্যক্রম ও কূটনীতি সেসব নীতিমালার আলোকেই বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

৫২· *The Farakka Barrage'*, External Publicity Division, Ministry of External Affairs, Goverment of India; New Delhi, Quoted in Nahid Islam, *প্রাগুক্ত।*

৫৩· Nahid Islam, *প্রাগুক্ত।*

৫৪· BWDB Source, cited in Nahid Islam. *প্রাগুক্ত,* পৃ-২৮৮।

www.pathagar.com

প্রাচীনকালে আন্তর্জাতিক পানি ব্যবহারের দু'টো তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। একটি হলো 'সীমাহীন ভূ-খন্ডগত সার্বভৌমত্ব' (Unlimited Territorial Sovereignty); অপরটি হলো 'সীমাহীন ভূ-খন্ডগত সংহতি, (Unlimited Territorial Integrity)। প্রথমোক্ত তত্ত্বটি উন্নয়ন করেছিলো উজানের দেশ এবং দ্বিতীয়টি উন্নয়ন করেছিলো ভাটির দেশ। উল্লিখিত চরম দু'টি তত্ত্বই একচেটিয়া জাতীয় স্বার্থের নীতি থেকে উৎসারিত যা আজকের পৃথিবীতে অচল।

বর্তমানকালের তত্ত্বটি তাই 'পারস্পরিক বিনিময়ের' (Reciprocity) নীতির উপর নির্ভরশীল যা একে অপরের অধিকার ও বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে নেয়। আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের বর্তমান নীতিতে ন্যায়ানুগ বন্টন বা ব্যবহার, অপরের ব্যাপক ক্ষতি এড়ানো প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। ন্যায়ানুগ বন্টন বলতে পানি সম্পদের এমন ব্যবহারকে বুঝানো হয়েছে যাতে সকল রাষ্ট্রই তা থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে। এ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী ব্যবহারের ব্যাপারে নমনীয় নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মীমাংসাকারী হিসেবে ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে গৃহীত আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সম্পর্কিত 'হেলসিংকি নীতিমালা' (Helsinki Rules) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৫৫] হেলসিংকি নীতিমালার চতুর্থ ও পঞ্চম ধারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'পারস্পরিক বিনিময় নীতি'র অপর বিষয়টি হলো ভাটি রাষ্ট্রের 'ব্যাপক ক্ষতি' এড়িয়ে চলা। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠছে ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে। ভাটির রাষ্ট্র যাকে 'ব্যাপক ক্ষতি' (Substantial Injury) বলে দাবী করছে, উজানের রাষ্ট্র তাকে 'স্বল্প ক্ষতি' (Minor Injury) বলে ব্যাখ্যা করছে। কোনটি 'ব্যাপক ক্ষতি' এবং কোনটি 'স্বল্প ক্ষতি' তার বৈশিষ্ট নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। কেবল সুস্পষ্ট ঘটনা দ্বারাই এ বিষয়টি নির্ধারণ করা সম্ভব। প্রসঙ্গত ক'জন আইনজ্ঞের বক্তব্য দেয়া হলো। C.B. BOURNE বলেন:

"A reparian has the legal right to utilize the water of an international river in its territory of its doing so causes no

৫৫. *BIISS Papers*, Vol-5, December 1986, p-26.

www.pathagar.com

substantial injury to Co-riparian states. So all major interference by a riparian state with the water of an international river within its territory that seriously affects the use and enjoyment of the same water system by co-riparian states having rightful shares is illegal." [৫৬]

বিখ্যাত আইনবিদ J.L Brierly S L. Openheim অভিন্ন মত প্রকাশ করেন।[৫৭] এ মূলনীতিটি বর্তমানে প্রথাসিদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশ।

আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার সকল রাষ্ট্রের পানি ব্যবহারের বৈধ অধিকারের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত সমূহে ঐকমত্য (Unanimity) লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে 'লীগ অব ন্যাশনস্' এর 'Permanent Court of International Justice' (PCIJ) এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। PCIJ এর মতে ঃ

"Countries have a common legal right to the resources of a shared river, not just a right of passage, the essential characteristics being the 'community of Interest' of all the parties in the use of river and exclusion of preferantial privilege of any riparian state in relation to others."[৫৮]

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন বিভিন্ন চুক্তি, কনভেনশন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। বিশ্বের সাধারণ অববাহিকার দেশগুলোর মধ্যে এ যাবত প্রায় দু'শ'রও বেশী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি এবং কনভেনশন হয়েছে। [৫৯] এদের মধ্যে মেক্সিকো বনাম

---

৫৬. C. B. Bourne, *'The Right to Utilize the Waters of International Rivers'*, Canadian Year Book of Internation Law, Vol-3, (1965). pp-188-259, cited in BIISS Paper, Vol-5, December 1986, p-26.

৫৭. BIISS Paper,Vol-5, December 1986, *প্রাগুক্ত।*

৫৮. Parmanent Court of International Justice, Order Case, 1929; cited in BIISS Papers, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৭।

৫৯. BIISS Paper, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৮।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি, রাইন নদী চুক্তি, মিশর বনাম সুদানের নীল নদী চুক্তি, নিম্ন মেকং অববাহিকা চুক্তি, সিন্ধু অববাহিকা চুক্তি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সার্বজনীন চুক্তি বা কনভেনশন না হওয়ায় এ সমস্ত চুক্তির নীতিমালা তৃতীয় কোন পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে না। আন্তর্জাতিক প্রথাসিদ্ধ আইনের এ সমস্যা থাকার পরও এ কথা আজ সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত (আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি অনুযায়ী) যে, যখন কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি বা কনভেনশন থাকবে না তখন বিষয়টি প্রথাসিদ্ধ আইনের মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে। [৬০]

বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজ জাতিসংঘের সদস্য। তাই জাতিসংঘের নির্দেশাবলী মেনে চলা প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে জাতিসংঘও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যা বাস্তবায়িত হলেও এ সম্পর্কিত অনেক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে। ১৯৭২ সালের ১৫-১৬ই জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে (United Nations Conference on Human Environment) একাধিক বৈধ কর্তৃত্ব সম্পর্কিত সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হয়। [৬১]

সুপারিশ নং ৫১

'সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট সরকারগণ একাধিক বৈধ কর্তৃত্বের পানি সম্পদের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পানি অববাহিকা

৬০· আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির 38(1)b অনুচ্ছেদে প্রথাকে আন্তর্জাতিক আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, Statute of International Court of Justice, Appendix E, Charles G. Fenwick, *'Internation Law'* New York. 1952, p-716

৬১· 'Report of the U.N. Conference on the Human Environment, Recomendation 51, UN. Doc No. A/Cop. 48/3 and con' (1972), *International Legal Materials*, cited in বি এম আব্বাস এ টি *'আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টন : গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র'* আবুল কালাম (সম্পা), সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ-১৬৭।

www.pathagar.com

কমিশন (River Basin Commission) গঠনের কথা বিবেচনা করবেন।

ক· জাতিসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশকে তার নিজের সম্পদ উন্নয়নে স্থায়ী কর্তৃত্বের বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

খ· রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা নিম্নের নীতিমালা যখন প্রযোজ্য বিবেচিত হওয়া উচিত—

১· জাতিগুলি একমত যে যখন এমন সব বড় পানি সম্পদ কাজকর্মের কথা চিন্তা করা হয় যা অন্য একটি দেশের পরিবেশের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তখন কাজকর্ম আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই অন্য দেশটিকে জানিয়ে দিতে হবে;

২· পরিবেশগত দিক থেকে সকল পানি সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে পানির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রত্যেক দেশের পানি দূষণ পরিহার করা।

৩· একাধিক জাতীয় কর্তৃত্বের অন্তর্গত পানি বিজ্ঞানের সুফল সংশ্লিষ্ট জতিগুলোকে ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করে নিতে হবে।

গ· সংশ্লিষ্ট দেশগুলো যুক্তিসংগত মনে করে এমন সব ব্যবস্থা যাতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রহণ করা যায়—

১· সংশ্লিষ্ট দেশগুলো দ্বারা স্বীকৃত কোন আন্তর্জাতিক ব্যবহারের মাধ্যমে পানি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যের আহরণ, সমীক্ষা ও আদান প্রদান;

২· পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে তথ্য আহরণের কর্মসূচী;

৩· বিদ্যমান পানি ব্যবহারে পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া নিরূপণ;

৪· কারিগরি, অর্থনীতিক ও সামাজিক বিবেচনায় পানির মান সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনা;

৫· মান নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীসহ পরিবেশের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পানি সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার;

৬· পানির ব্যবহার ও দাবী রক্ষার্থে বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনগত ব্যবস্থা;

www.pathagar.com

৭· পানি সম্পদের পরিচালনা ও সংরক্ষণের বিষয়ে বিরোধের নিবারণ ও নিষ্পত্তি;

৮· অংশভোগী সম্পদের (Shared Resources) অর্থনীতিক ও কারিগরী সহযোগিতা।

ঘ· উপর্যুক্ত বিবেচনাগুলো বর্ধিত করার জন্য আঞ্চলিক সম্মেলন সংগঠন করা উচিত।"

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের উপরিউক্ত মৌলিক নীতিমালা ও সুপারিশের আলোকে ভারতের পানি বিষয়ক কার্যক্রমকে এক কথায় আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন বলা যায়। ভারত প্রায় সব নদীর পানিই একতরফাভাবে প্রত্যাহার অব্যাহত রেখেছে (পূর্বেই আলোচিত হয়েছে) ফলে বাংলাদেশের নদীগুলোতে বিশেষ করে গঙ্গায় শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। নদীর পানির হিস্যার নিশ্চয়তার অভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে ভারতের পানি বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ যে বাংলাদেশের জন্য 'ব্যাপক ক্ষতি' (Substantial Injury) বয়ে আনছে— যা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন এতে কোন সন্দেহ নেই।

২.১.২ সমুদ্র সীমা নির্ধারণ

সমুদ্র উপকূলীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপকূল পশ্চিম দিকে ভারতের সাথে এবং পূর্ব দিকে বার্মার সাথে সংযুক্ত। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের উপকূল অবতল আকৃতির (Concave Nature)। অপর পক্ষে, মায়ানমার এবং ভারতের উপকূল উত্তল আকৃতির (Convex Nature)। ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণে ভারত ও মায়ানমার উপকূলের উত্তল আকৃতি এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আজো এ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমুদ্র সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে কোন যুক্তিসঙ্গত ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এ সীমা নির্ধারণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমান্ত তিন দিক দিয়ে ভারত দ্বারা বেষ্টিত। একমাত্র দক্ষিণ দিক (বঙ্গোপসাগর) দিয়ে বাংলাদেশ যুক্ত হলেও ভারত মহাসাগরে ভারতীয় ব্লু ওয়াটার নেভীর শক্তিশালী অবস্থান, ভারতীয় উপকূলের

www.pathagar.com

উত্তলতা, বিপরীত ভূখন্ড আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান কার্যতঃ বাংলাদেশকে ভূবেষ্টিত রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

২.১.২ ক. সমুদ্র সীমা নির্ধারণের প্রাথমিক কথা

বর্তমান বিশ্ব ক্ষুধা, দারিদ্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর ভূখন্ডগত সম্পদ ততই নিঃশেষ হতে চলেছে। তাই সামুদ্রিক সম্পদ মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন সমুদ্রের উপর তার অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সমুদ্রের বিশাল এলাকাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সীমানায় চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা ঃ

i) সমুদ্র তটরেখা বা ভিত্তিরেখা (Base line),
ii) আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea)
iii) সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল (Contiguous Zone)
iv) সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল (Exclusive Economic zone—— EEZ)
v) মহীসোপান (Continental Shelf),
vi) উন্মুক্ত সমুদ্র (High Sea),

i) সমুদ্র তটরেখা

ভাটার সময় উপকূলের পানি যে শেষ প্রান্তে অবস্থান করে সে স্থান বরাবর কল্পিত রেখাকেই তটরেখা বা ভিত্তিরেখা বলে। এ স্থান থেকেই উপকূলের সমুদ্র অঞ্চল পরিমাপ করা হয়। যেসব স্থানে উপকূল রেখা গভীর খাতযুক্ত অথবা যেখানে উপকূল বরাবর সন্নিকটে দ্বীপমালা রয়েছে, সেখানে সর্বশেষ দূরত্বের স্থান সমূহকে একাধিক সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করে তটরেখা নির্ধারণ করা হয়। তটরেখার অভ্যন্তরস্থ সমুদ্র এলাকা উপকূলীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলরাশি সংক্রান্ত শাসনবিধির আওতাধীন থাকে। ১৯৫১ সালে নরওয়ে এ পদ্ধতিতে ৪৮টি বিন্দু হতে প্রসারিত রেখার দ্বারা তার ভিত্তিরেখা নির্ধারণ করেছিল।

www.pathagar.com

ii) আঞ্চলিক সমুদ্র

তটরেখা হতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এ সমুদ্র অঞ্চলকেই আঞ্চলিক সমুদ্র বলে। আঞ্চলিক সমুদ্রের দূরত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে এ দূরত্ব ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণ করা হয়। (অনুচ্ছেদ ঃ ৩)[৬২]

iii) সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল

আঞ্চলিক সমুদ্রের সংলগ্ন সমুদ্র এলাকাকে উপকূলীয় রাষ্ট্রের 'সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল' বলা হয়। ফ্রান্সের আইনবিদ গিডেট সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল ধারণাটির প্রবর্তক। ১৯৩০ সালের জেনেভা কনভেনশনে এ ধারণা প্রচার করা হয়। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩৩ (২) নং অনুচ্ছেদে আঞ্চলিক সমুদ্র হতে গভীর সমুদ্রের পরবর্তী ১২ নটিক্যাল মাইল অর্থাৎ তটরেখা হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল অঞ্চলকে সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়।[৬৩] প্রধানতঃ মৎস্য শিকার সংক্রান্ত বিধিবিধানের জন্য এবং চোরাচালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এ সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলের ধারণা প্রবর্তন করা হয়। সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের আধিপত্য সুনিশ্চিত করার জন্য সংলগ্ন অঞ্চলকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা—শুল্ক অঞ্চল (Custom Zone), মৎস্য শিকার অঞ্চল (Fishing Zone), স্বাস্থ্যকর অঞ্চল (Sanitary Zone), অভিবাসন অঞ্চল (Immigrational Zone)।

iv) সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল (EEZ)

চিরাচরিত নিয়ম আনুসারে আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে সমস্ত সমুদ্র এলাকা উন্মুক্ত সমুদ্র (High Sea) বলে বিবেচিত হতো। সেখানে সকল রাষ্ট্রের অবাধ স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু কোন কোন উপকূলীয় রাষ্ট্র অর্থনীতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের আঞ্চলিক সমুদ্রের সীমা বৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে

৬২· গাজী শামছুর রহমান, *'আন্তর্জাতিক আইনের ভাষ্য'* পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ-১১৭।

৬৩· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১২৫।

www.pathagar.com

উন্মুক্ত সমুদ্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংকুচিত হতে থাকে এবং উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। এটা নিরসনের জন্য ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহকে 'সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল' প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রদান করা হয়। এখানে উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া অর্থনীতিক অধিকার থাকে (অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫)। এটি ভিত্তিরেখা হতে সমুদ্রে সর্বোচ্চ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে (অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭) [৬৪] উল্লেখ্য যে, এ নীতির ফলে ৭ মাইল ব্যাসার্ধের একটি দ্বীপ প্রায় ১,৩৩,৫৩৩ বর্গমাইল সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চলের অধিকারী হবে।[৬৫]

v) **মহীসোপান**

মহাদেশের কিছু অংশ সমুদ্রের পানির মধ্যেই বিস্তৃত থাকে। এখানে সমুদ্রের গভীরতা কম থাকে। মহাদেশের এ স্বল্প গভীর নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে সাধারণভাবে কোন কোন দেশ ভিত্তিরেখা হতে সমুদ্র বক্ষে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপান বিস্তৃত করতে পারবে। তবে কোন উপকূলীয় রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ৩৫০ নটিক্যাল মাইল বা ২৫০০ মিটার গভীর সমুদ্র তলদেশ হতে ১০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত তার মহীসোপানকে বিস্তৃত করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬)।[৬৬]

vi) **উন্মুক্ত সমুদ্র**

১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশন মতে, কোন রাষ্ট্রের সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল, আঞ্চলিক সমুদ্র বা অভ্যন্তরীণ জলরাশি বা দ্বীপপুঞ্জ দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত জলরাশির বাইরের সমুদ্রাংশই উন্মুক্ত সমুদ্র (অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬)। [৬৭] উন্মুক্ত সমুদ্র সমগ্র মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। কোন বিশেষ রাষ্ট্র এর উপর সার্বভৌমত্ব দাবী করতে পরবে না। সমুদ্র আইনের

৬৪· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১২৯।

৬৫· M. Habibur Rahaman, *'Delimitation of Maritime Boundaries : Some Pertinent Issues for Bangladesh'*; in M.G. Kabir and Shaukat Hassan (ed), *'Issues and Challenges Facing Bangladesh Foreign Policy*; BSIS, 1989, p-109.

৬৬· M. Habibur Rahaman, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১১।

৬৭· গাজী শামছুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩২।

www.pathagar.com

আওতায় রাষ্ট্রসমূহ এখানে তাদের অধিকার ভোগ করবে।

১৯৮২ সালের ১০ই ডিসেম্বর জ্যামাইকার মন্টেগোতে অনুষ্ঠিত সমুদ্র বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে 'সমুদ্র আইন কনভেনশন'টি গৃহীত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ১৫০টিরও বেশী দেশের মধ্যে ১১৯টি দেশ তাতে স্বাক্ষর প্রদান করে। এ কনভেনশন গৃহীত হওয়ার পরও সমুদ্র সীমা বিষয়ক বিতর্কের সমাপ্তি ঘটেনি। এখনো অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যারা তাদের 'আঞ্চলিক সমুদ্র' কনভেনশনে বর্ণিত ১২ নটিক্যাল মাইলের বেশী ভোগ করছে। লেটিন আমেরিকার দেশসমূহ চল্লিশের দশক হতে এখন পর্যন্ত ২০০ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র ভোগ করছে। [৬৮] এতে অপরাপর রাষ্ট্রসমূহ আপত্তি তুলছে। সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ নিয়ে সংলগ্ন (Adjacent) ও বিপরীত (Opposite) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন সামুদ্রিক অঞ্চলের প্রতীকী চিত্র — চিত্র-৪

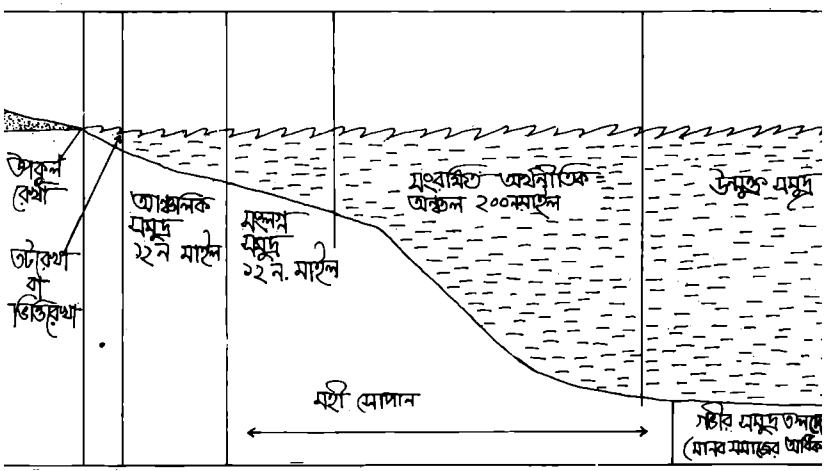

২.১.২ খ. বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের স্বার্থ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ। এর অর্থনীতিক শক্তি অত্যন্ত কম। স্বভাবতঃই অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো তারও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্যে

৬৮ M. Habibur Rahaman, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১০।

www.pathagar.com

বঙ্গোপসাগর প্রয়োজন। বাংলাদেশের ভূ-ভাগে কেবল লবণ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন আকরিক খনিজ নেই। কিন্তু বঙ্গোপসাগর আকরিক খনিজে সমৃদ্ধ। এখানে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যালুমিনিয়াম, তেজঃক্রিয় ভারী খনিজ পদার্থ, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতির বিপুল সঞ্চয় রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।[৬৯] এ প্রসঙ্গে J P. Morgan (১৯৭০) এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

"Old channels should be ideal place for oil reservoirs if such deposits (sedimentation) have been preserved in ancient rocks. The Ganges plain is subject to tectonic activity and small recent faults are found, some of them producing basins."[৭০]

বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাহিদা অভ্যন্তরীণ নদ-নদী থেকেই পূরণ করে থাকে। কিন্তু এ দেশের অর্থনীতিক প্রয়োজন পূরণে তা যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগর সম্ভাবনার এক উদার দিগন্ত। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশ মৎস্য চাষের উপযুক্ত স্থান। তাছাড়া উপকূলের বিপুল সংখ্যক জেলে মাছ ধরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হলো বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য এককভাবে এ পথের উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া তিন দিকে ভারত পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের একমাত্র উন্মুক্ত পথ হলো এই বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ সভার ৩৪৮৭ (xxx) নং প্রস্তাব মতে একটি স্বল্পতম উন্নত দেশ (Least Developed Country)।[৭১] সুতরাং স্বভাবতঃই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে বঙ্গোপসাগরের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৬৯· মোহাম্মদ আবদুর রব, *'দক্ষিণ তালপট্টি-নিউমুর বিতর্ক ঃ একটি ভূ-রাজনৈতিক পর্যালোচনা,'* রাজনীতি, অর্থনীতি, জার্নাল, সংখ্যা-১, ১৯৯১, পৃ-৭।

৭০· M. Habibur Rahaman, *'Delimitation of Maritime Boundaries—A Survey of Problems in the Bangladesh Case'*, Asian Survey, Vol-24, No-12. December 1984, p-1315.

৭১· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩০৬।

www.pathagar.com

২.১.২ গ. বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণে বিরোধ

বাংলাদেশ 'ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক রাষ্ট্র' (Geographically Disadvantaged state) হওয়ায় তার পক্ষে সমুদ্রে পুরোপুরি অধিকার একা ভোগ করা সম্ভব নয়।[৭২] বাংলাদেশ তার সমুদ্র অঞ্চল যখনই বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে তখনই সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্র মায়ানমার ও ভারত তাতে বাধা প্রদান করে। বাংলাদেশের একার পক্ষে ২০০ নটিক্যাল মাইল সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল ভোগ করা সম্ভব নয় এ উপকূল সংলগ্নতার কারণে। তাই এ উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমুদ্র সীমা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের কোন চুক্তিভিত্তিক সমুদ্র সীমা নেই। তাই সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। এ বিরোধের সূত্রপাত হয় ১৯৭৪ সালে, যখন বাংলাদেশ চুক্তির মাধ্যমে ছয়টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীকে বঙ্গোপসাগরের আঞ্চলিক সমুদ্রে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের অধিকার প্রদান করে। বাংলাদেশের গৃহীত সামুদ্রিক সীমারেখা পশ্চিম প্রান্তের ভিত্তিরেখার শেষ বিন্দু হতে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। অপরদিকে ভারতের গৃহীত সামুদ্রিক সীমারেখা ঐ বিন্দু হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে। ফলে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটারের বিতর্কিত একটি কৌণিক অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে যা উভয় রাষ্ট্রই স্ব স্ব যুক্তিতে নিজের অর্থনীতিক অঞ্চল বলে দাবী করছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি জটিল সমস্যা। ভারতের প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত উপকূল রয়েছে।[৭৩] সে হিসেবে সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চলের পরিমাণও প্রচুর। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের উপকূল মাত্র ৩১০ কিলোমিটার যা আবার অবতল আকৃতির হওয়ায় একটি জটিল সীমা নির্ধারণী সমস্যার সৃষ্টি করেছে।[৭৪] বিতর্কিত এ

---

৭২. M. Habibur Rahaman, '*Delimitation of Maritime Boundaries : Some Pertinent Issues for Bangladesh*', *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১৪।

৭৩. V. D. Mahajan, *International Relations since 1900*, New Dehli, 1986. p-818.

৭৪. M. Habibur Rahaman, *প্রাগুক্ত*, Asian Survey, Vol-24, No-12. December, 1984, p-1306.

www.pathagar.com

কৌণিক অঞ্চলের প্রাপ্তি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ নিয়ে ১৯৭৪ সাল হতেই ভারত-বাংলাদেশ আলোচনা চলছে কিন্তু বাংলাদেশ উপকূলের অবতল আকৃতির কারণে আজো তার কোন সমাধান হয়নি। বাংলাদেশের উপকূলের অবস্থান এমন যে, এখানে কোন সুস্পষ্ট নীতির মাধ্যমে সীমা নির্ধারণ সম্ভব নয়। কেবল ন্যায়পর নীতি এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। বিপরীত পক্ষে ভারত বাংলাদেশের দাবীকে অগ্রাহ্য করে 'সমদূরত্ব' (Equidistance) নীতিতে অটল রয়েছে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'ন্যায়পর' নীতি কথা বলা হলেও ভারতের পক্ষ থেকে তা একতরফাভাবে প্রত্যাখ্যান উভয় রাষ্ট্রের সমুদ্র সীমা নির্ধারণী আলোচনায় অচলাবস্থায় সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ তার দাবীর পক্ষে ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক মীমাংসিত পশ্চিম-জার্মানী, নেদারল্যান্ড ও ডেনমার্কের মধ্যকার উত্তর-সাগর মহীসোপান (North Sea Continental Shelf Case) মামলাটির উল্লেখ করে। এ মামলায় দেখা যায়—পশ্চিম-জার্মানীর উপকূলটি ছিল অবতল আকৃতির, পক্ষান্তরে, নেদারল্যান্ড ও ডেনমার্কের উপকূল ছিল উত্তল আকৃতির। এখানে পশ্চিম-জার্মানীর মহীসোপান ও অর্থনীতিক অঞ্চলের পরিমাণ যদি 'সমদূরত্ব নীতি'র ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো তবে পশ্চিম জার্মানীর সমুদ্র অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যেতো। তাই আন্তর্জাতিক আদালত সমদূরত্বের নীতি থেকে কিছুটা সরে গিয়ে 'ন্যায়পর নীতি'র (Equity) ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমুদ্র অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করে। আদালতের রায়ে, নেদারল্যান্ড-এর নিকট থেকে ৫০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং ডেনমার্কের নিকট থেকে ৭০০০ বর্গ কিলোমিটার মহীসোপান কেটে পশ্চিম-জার্মানীকে দিয়ে দেয়া হয়।[৭৫] এতে পশ্চিম-জার্মানীর মোট মহীসোপানের পরিমাণ হয় ৩৫,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। সুতরাং আন্তর্জাতিক আদালতের এ রায় থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, যদি বিপরীত ও সংলগ্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমুদ্র সীমা বিষয়ক জটিলতার সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে

---

৭৫. Federal Republic of Germany V. Danmark; Republic of Germany V. Netherlands, ICJ, General list : Nos 51 and 52, cited in M. Habibur Rahaman, *'Delimitation of Maritime Boundaries : Some Pertinent Issues for Bangladesh'*, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১৩।

www.pathagar.com

উপকূল রেখার উত্তলতা (Convexity) ও অবতলতা-র (Concavity) বিষয়টি বিবেচনায় আনা হবে এবং অবতল উপকূল রেখার রাষ্ট্রের সমুদ্র সীমা 'সাম্য নীতি'র ভিত্তিতে সীমাংসিত হতে পারে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় নতুন জেগে ওঠা চর দক্ষিণ তালপট্টি/নিউমূর দ্বীপ-এর মালিকানা প্রশ্নে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীপটি বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েরই মূল ভূ-খন্ড থেকে অতি নিকট সমুদ্রে অবস্থিত। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ-গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলে যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং সে কারণে উপকূলীয় বন্যা (গর্কি) আঘাত হানে- তার ঠিক পরেই এ বিতর্কিত ক্ষুদ্র দ্বীপটির (২৫০০ বর্গ মিটার) আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ছয়টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীকে বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের অধিকার প্রদান করলে উভয় রাষ্ট্রে নতুন দ্বীপটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও অনুসন্ধান তপরতা শুরু হয়। ভারত দ্বীপটির মালিকানা প্রশ্নে 'মধ্য রেখা নীতি' (Median Line) এবং বিপরীতপক্ষে, বাংলাদেশ 'মধ্যস্রোত রেখা নীতি' (Mid-channel Flow)-এর কথা বলে। এ নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা হলেও উভয়ের অনড় নীতির ফলে এর কোন সুস্পষ্ট সমাধান আজো হয়নি। (দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের বিষয়টি যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) মূলতঃ এ বিষয়টি যতটা না আন্তর্জাতিক আইন ভিত্তিক তার চেয়ে বেশী জরিপ ভিত্তিক। পরস্পর বিরোধী ভৌগোলিক তথ্যই এ সমস্যাকে আজো জিইয়ে রেখেছে ও জটিল করে তুলেছে।

বাংলাদেশের মহীসোপান নির্ধারণ নিয়েও ভারতের সাথে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের জন্য একই সাথে সংলগ্ন (Adjacent) ও বিপরীত (Opposite) রাষ্ট্র। পশ্চিমাংশে ভারত বাংলাদেশের সংলগ্ন রাষ্ট্র, আবার দক্ষিণে ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অবস্থানের কারণে সে বিপরীত রাষ্ট্র। ফলে বাংলাদেশের মহীসোপান এদেশের উপকূল, ভারতের মূল ভূ-খন্ডের উপকূল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপুঞ্জের উপকূল এবং শ্রীলংকার উপকূল এ চারটি বিন্দু দ্বারা পরিমাপ করা হবে। এতে ভারত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে এবং বাংলাদেশ মহীসোপানের একটা বিরাট অঞ্চল হারাবে।

www.pathagar.com

২.১.২ ঘ. সমুদ্র আইন কনভেনশন ও বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণ

বাংলাদেশের উপকূল ভারত ও মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত। সমুদ্র নির্ধারণের বিষয়টিও তাই এ দু'দেশের সাথেই সংযুক্ত। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণে সমুদ্র আইন কনভেনশনের প্রায়োগিক বহুবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাযাক।

i) ভিত্তিরেখা বা তটরেখা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদী প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে থাকে। প্রধান প্রধান নদীগুলো প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২·৪ বিলিয়ন টন পলি বহন করে।[৭৬] এ বিপুল পরিমাণ পলির কিয়দংশ নদী বক্ষকে উঁচু করে এবং অবশিষ্ট ব্যাপক অংশ বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এতে বাংলাদেশের উপকূল ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন ভূমি গঠন করছে। আবার প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টিপাত, ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক ঢেউ প্রভৃতি কারণে উপকূলীয় পলল ভূ-খন্ড নিয়ত ক্ষয়িষ্ণু। ফলে এদেশের উপকূল অনিয়মিত ও অস্থায়ী যা তটরেখা বা ভিত্তিরেখা নির্ধারণে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

উপরিউক্ত ভূ-তাত্ত্বিক (Geomorphological) কারণে সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩ ও ৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'সাধারণ ভিত্তিরেখা' (Normal Baseline) বা 'সরল ভিত্তিরেখা' (Straight Baseline) নীতির কোনটিই বাংলাদেশের ভিত্তিরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ জন্যে বাংলাদেশে ৪ নং অনুচ্ছেদটির সংশোধন করে উপরিউক্ত প্রাকৃতিক বৈশিষ্টও তাতে সংযোজিত করার জন্যে ১৯৭৪ সালেUNCLOS-III কারাকাস সেশনে প্রস্তাব উথাপন করে।[৭৭] প্রস্তাবে গভীরতার ভিত্তিতে ভিত্তিরেখা নির্ধারণের কথা বলা হয়। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৭ (২) অনুচ্ছেদে গভীরতা পদ্ধতিকে (Depth-method) স্বীকার করা হলেও সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে বাংলাদেশ তার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থাকে বিবেচনা করে দশ ফ্যাদম সমুদ্র সমোন্নতি রেখাকে ভিত্তিরেখা হিসেবে ঘোষণা করে। এ ভিত্তিরেখা

---

৭৬. Nahid Islam, '*The Ganges Water Dispute : Environmental and related Impacts on Bangladesh*', BIISS Journal Vol-12. No-3. 1991. p-282

৭৭. United Nations Conference on the Law of the Sea-III (UNCLOS-III)

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উপকূল হতে স্থানভেদে ১৬ হতে ৩০ নটিক্যাল · মাইল অগভীর সমুদ্রেঅবস্থিত।[৭৮] মোট আটটি বিন্দু থেকে এ ভিত্তিরেখা টানা হয়েছে। নিম্নে ছকটি দেয়া হলো ঃ

সূচী ঃ ৪ বাংলাদেশের গভীরতা ভিত্তিক ভিত্তিরেখা[৭৯]

ভিত্তিরেখা বিন্দু	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
১·	২১°১২´ ০০´´ উ·	৮৯°০৬ ৪৫´ পূ·
২·	২১°১৫ ০০´´ উ·	৮৯°১৬ ০০´´ পূ·
৩·	২১°২৯ ০০´´ উ·	৮৯°৩৬ ০০´´ পূ·
৪·	২১°২১ ০০´´ উ·	৮৯°৫৫ ০০´´ পূ·
৫·	২১°১১ ০০´´ উ·	৮৯°৩৩ ০০´´ পূ·
৬·	২১°১০ ০০´´ উ·	৯১°০৬ ০০´´ পূ·
৭·	২১°১০ ০০´´ উ·	৯১°৫৬ ০০´´ পূ·
৮	২০°২১ ৪৫´´ উ·	৯২°১৭ ৩০´´ পূ·

উৎস ঃ Bangladesh Ministry Foreign Affairs (Circular No. Lt-1/3/74)

উপকূল রেখাকে (Coast line) যদি ভিত্তিরেখা ধরা হতো তবে সংলগ্ন রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত কোন বিরোধই দেখা দিত না। কেননা, এতে আঞ্চলিক সমুদ্র উপকূলের খুব নিকটেই অবস্থান করতো। কিন্তু এর গভীরতা পদ্ধতিতে (বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক বাস্তবতার কারণে) ভিত্তিরেখা নির্ধারণ করায় ভিত্তিরেখার মধ্যবর্তী এক বিরাট সমুদ্র অঞ্চল এ দেশের অভ্যন্তরীণ পানি সম্পদ (Internal Water) বলে বিবেচিত হবে এবং স্বভাবত ঃই আঞ্চলিক সমুদ্রের দূরত্বও উপকূল থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে যা এদেশের ভূ-রাজনীতির জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থান। এ কারণেই সংলগ্ন রাষ্ট্রসমূহের সাথে ভিত্তিরেখা সংক্রান্ত এ জটিলতার একটি চুক্তিভিত্তিক

৭৮· M. Habibur Rahaman, '*Delimitation of Maritime Boundaries—A Survey of Problems in Bangladesh* , Asian Survey, Vol-24, No-12. December 1984 University of California পৃ-১৩১২।

৭৯· *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩১৩।

www.pathagar.com

সমাধান প্রয়োজন।

ii) **আঞ্চলিক সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল**

বাংলাদেশ ভিত্তিরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল 'আঞ্চলিক সমুদ্র' নীতির সমর্থক এবং ১৯৭৪ সাল হতেই বাংলাদেশ এ নীতি মেনে চলছে। সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩৩ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রকে ভিত্তিরেখা হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল সংলগ্ন অঞ্চল ভোগের অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ আঞ্চলিক সমুদ্র হতে তার সংলগ্ন অঞ্চল ৬ নটিক্যাল মাইল ধরে আইন পাস করে। এতে ভিত্তিরেখা হতে সংলগ্ন অঞ্চলের দূরত্ব দাঁড়ায় ১৮ নটিক্যাল মাইল। উপকূল রেখা হতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রের দূরত্ব ২৮ হতে ৪২ নটিক্যাল মাইল এবং সংলগ্ন অঞ্চল ৩৪ হতে ৪৮ নটিক্যাল মাইল। এ সমুদ্র অঞ্চলের সীমা বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নির্ধারিত হতে হবে।

iii) **সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল ও মহীসোপান অঞ্চল**

প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রের সাধারণতঃ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিকাল মাইল মহীসোপান অঞ্চল ব্যবহারের অধিকার রয়েছে (সমুদ্র আইন কনভেনশন, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬)। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের ভূ-রূপ তাত্ত্বিক বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের পক্ষে একচ্ছত্রভাবে এ অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংলগ্ন ও বিপরীত রাষ্ট্র ভারত ও মায়ানমারও যদি একই সাথে ২০০ নটিক্যাল মাইল সংরক্ষিত অর্থনীতি অঞ্চল এবং মহীসোপান দাবী করে তবে তাদের দাবীকৃত অঞ্চল বাংলাদেশের দাবীকৃত অঞ্চলের উপর ছাপিয়ে যায়। মহীসোপন অঞ্চলের বিভাজনের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের মোট আয়তন ৮৭৯৩৭৫ বর্গমাইল এবং গড় গভীরতা ২৫৮৬ মিটার।[৮০] এ সাগরের মহীঢালের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ৩০০০ মিটার গভীরতায়।[৮১] সমুদ্র আইন কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী কোন উপকূলীয় রাষ্ট্র ভিত্তিরেখা হতে সর্বোচ্চ ৩৫০ নটিক্যাল মাইল অথবা ২৫০০ মিটার গভীর

---

৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩১৫।

৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩১৫।

www.pathagar.com

সমুদ্র তলদেশ হতে ১০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপান ভোগ করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬)। এখন বাংলাদেশ যদি এ 'গভীরতা-দূরত্ব' (Depth Cum Distance Method) নীতি অনুযায়ী সমুদ্রে তার মহাদেশীয় অঞ্চলের শেষ সীমা (Continental Margin) নির্ধারণ করে তবে তা হয়তো বা বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হবে। এ কারণে বঙ্গোপসাগরে 'গভীরতা-দূরত্ব' নীতি অপরাপর দু'টি রাষ্ট্রের পক্ষেও গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

২.১.২ ঙ. দক্ষিণ-তালপট্টি/নিউমুর দ্বীপ সমস্যা [৮২]

উপমহাদেশের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমারেখার প্রায় মধ্যভাগে বঙ্গোপসাগরের অগভীর উপকূলীয় সমুদ্রাঞ্চলে জেগে ওঠা ক্ষুদ্রাকার ভূ-খন্ড দক্ষিণ-তালপট্টি/নিউমুর দ্বীপ। দ্বীপটির জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই নানা যুক্তি-তর্ক দিয়ে দ্বীপটিকে স্ব স্ব মালিকানাভুক্ত বলে দাবী করে আসছে।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ-গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলে যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং সে কারণে উপকূলীয় বন্যা (গর্কি) আঘাত হানে তার ঠিক পরেই হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় (প্রায় ২ কি· মি· দক্ষিণে) এ বিতর্কিত দ্বীপটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ল্যান্ডসেট (Landsat) ও এ্যারিম (Erim) জরিপ ভূ-উপগ্রহ সূত্র থেকে সংগৃহীত দূর অনুধাবন চিত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, দ্বীপটি বাংলাদেশের নিকটবর্তী মূল ভূ-খন্ড থেকে মাত্র ৩০০০ মিটার দূরে অবস্থিত এবং দ্বীপটি থেকে নিকটতম ভারতীয় ভূ-খন্ডের দূরত্ব প্রায় ৫৫০০ মিটার (Landsat, TM Band-7, Feb 1988)। দক্ষিণ তালপট্টি ২১°৩৭´ ভিত্তিরেখা বিন্দু অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ ভিত্তিরেখাবিন্দু অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বর্তমানে দ্বীপটির আয়তন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ তালপট্টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩·২ কি. মি. দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ প্রায় ২·৫ কি. মি. বিস্তৃত।

মূলতঃ দ্বীপটির ভূ-রাজনীতিক গুরুত্বই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মালিকানা প্রশ্নে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। দ্বীপটির দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে

৮২· এ অংশটুকু বিশেষতঃ মোহাম্মদ আবদুর রব এর *'দক্ষিণ-তালপট্টি/নিউমুরবিতর্কঃ একটি ভূ-রাজনৈতিক পর্যালোনা;'* রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, ১ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯১ অবলম্বনে প্রণীত।

www.pathagar.com

বিস্তৃত হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক সম্পদের সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত এলাকার সমুদ্র তলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যালুমিনিয়াম, তেজঃস্ক্রিয় ভারী খনিজ পদার্থ ইত্যাদির বিপুল সঞ্চয় রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।[৮৩] যে দেশই দ্বীপটির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব লাভ করবে সে দেশ বঙ্গোপসাগরে 'স্বীয় আঞ্চলিক সমুদ্র' (Territorial Sea) এবং 'সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল' (EEZ) হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য বিরাট সমুদ্র এলাকার উপর সার্বভৌমত্ব এবং অধিকার লাভে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ যদি দ্বীপটিকে নিজ মালিকানায় লাভ করে তবে দ্বীপটির পশ্চিম দিয়ে হাড়িয়াভাঙ্গার মূল মধ্য-স্রোতরেখা ধরে প্রলম্বিত হয়ে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে গভীর সমুদ্রে এগিয়ে যাবে। এর ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশের 'আঞ্চলিক সমুদ্র' কৌণিকভাবে প্রবৃদ্ধি লাভ করে কয়েক হাজার বর্গ কি. মি. বেড়ে যাবে, অন্য দিকে একই নিয়মে দেশের 'সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল' বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে। এক হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রায় ২৫,০০০ বর্গ কি. মি. বা তার চেয়ে বেশী সমুদ্রাঞ্চল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৮৪] সুতরাং জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশ, অপরপক্ষে ভারতের নিকট এর গুরুত্ব যে অপরিসীম হবে তা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ-তালপট্টি/নিউমুর দ্বীপ সংক্রান্ত বিরোধটি যতটা না আন্তর্জাতিক আইন ভিত্তিক তারচে' বেশী সঠিক তথ্য বা জরিপ ভিত্তিক। এ দ্বীপ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তথ্যই এ বিরোধকে এখনো জিইয়ে রেখেছে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। দ্বীপটি থেকে উভয় রাষ্ট্রের দূরত্ব সম্পর্কে ভারতের দেয়া তথ্য হচ্ছে বাংলাদেশের নিকটতম ভূ-খন্ড থেকে এর দূরত্ব ৭·৫ কিলোমিটার এবং ভারতের ভূ-খন্ডের দূরত্ব ৫·২ কিলোমিটার।[৮৫] অথচ ভূ-

---

৮৩· T.K. Mallik, *Shelf Sedinents of the Ganges Delts with Special Emphasis on the Mineralogy of the Western Part*, Bay of Bengal, Marine Geology, Vol-22, No-1, Amsterdam, 1976, pp-1-30, cited in মোহাম্মদ আব্দুর রব, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৭।

৮৪· S. Mitra, *'New Moore Island : Territorial Tug of War'*, India Today (June, 1-15) Delhi, cited in মোহাম্মদ আব্দুর রব, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৮।

৮৫· Dr, S. S. Bindra, *Indo-Bangladesh Relations*, New Delhi, 1982 p-58

www.pathagar.com

উপগ্রহ থেকে তোলা দূর অনুধাবন চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশ থেকে দ্বীপটির দূরত্ব ৩০০০ মিটার এবং ভারত থেকে এর দূরত্ব ৫৫০০মিটার।[৮৬]

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ছয়টি বিদেশী তেল কোম্পানীর সাথে দেশের আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল অনুসন্ধান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করলে দু'দেশেই দ্বীপটি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা ও অনুসন্ধান তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭৯ সালে দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে দেশ দু'টির মাঝে প্রচুর বাক-বিতন্ডা চলতে থাকে। পরিশেষে ১৯৭৯ এর এপ্রিল মাসে যখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারী সফরে ঢাকা এলেন তখন বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান দক্ষিণ-তাপট্টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং সেই সাথে বিষয়টি মীমাংসার জন্যে যৌথ জরিপ পরিচালনার প্রস্তাব উথাপন করেন। ভারত সরকার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। কিন্তু বিষয়টির কোন মীমাংসা হবার পূর্বেই ১৯৮০ সালে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (B.S.F) সদস্যরা দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং ভারতের মানচিত্রযুক্ত কংক্রিটের ফলক-খুঁটি স্থাপন করে। এতে বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে প্রতিবাদ-সমাবেশ ঘটানো হয়। ১৯৮০ সালে ভারতের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন হয়ে পুনর্বার কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস সরকার যৌথ জরিপের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮১ সালের দিকে এ নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ প্রায় সংঘর্ষের দিকে যায়। ও বছর মে মাসে ভারত 'সন্ধ্যায়ক' নামের একটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। এতে বাংলাদেশও ক্ষুব্ধ হয়ে পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্যে তিনটি ক্ষুদ্রকায় যুদ্ধ জাহাজ (Gun Boat) প্রেরণ করে এবং অবিলম্বে সেখান থেকে ভারতীয় সৈন্য ও সরঞ্জামাদি প্রত্যাহার করে নেয়ার দাবী জানায়। কিন্তু ভারত সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে নিজ প্রাধান্য বজায় রাখতে আজো সচেষ্ট রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশও তার দাবীতে অটল।

দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপের আকৃতি প্রায় গোলাকার এবং ভাটার সময় সমুদ্রের পানি নেমে গেলে দ্বীপটিকে অনেকটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির (Crescent Shape)

---

৮৬. মোহাম্মদ আব্দুর রব, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২।

www.pathagar.com

ভূ-ভাগ বলে মনে হয়। হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল স্রোতধারা দ্বীপটির পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ স্রোতধারার গড় গভীরতা প্রায় ২০ মিটার। দ্বীপটির সরাসরি উত্তরে বাংলাদেশের ভূ-খন্ড তালপট্টি (সাতক্ষীরা জিলাধীন) এবং দক্ষিণে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। অতি সম্প্রতি ভূ-উপগ্রহ উপাত্ত দক্ষিণ-তালপট্টির উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে স্বল্প গভীর সামুদ্রিক পানিতে প্রায় জেগে ওঠা বিশাল ডুবন্ত ভূ-খন্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করছে (ERTS/NASA, Hyderabad 1989-90)।[৮৭] দ্বীপটির চারপাশের ভূ-রূপতাত্ত্বিক (Geomorphological) অবস্থা এবং হাড়িয়াভাঙ্গা ও রাইমঙ্গল নদীদ্বয়ের পানিতাত্ত্বিক (Hydrological) চল-প্রক্রিয়া থেকে অনুমান করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে দ্বীপটি উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে একীভূত হয়ে যাবে। দ্বীপটির উত্তর ও পূর্বাংশে নতুন গড়ে ওঠা ভূমির বিস্তার বেশী; কিন্তু হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল স্রোতধারার প্রবাহ হেতু দ্বীপটির পশ্চিমাংশে বেশী পরিমাণে পলির সঞ্চয় ঘটছে না। বরং স্রোতের প্রভাবে পশ্চিম পশ্চিমাংশের বেশ কিছু পুরোনো মগ্নচরা ক্ষয়ীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ মগ্নচরাগুলোর অবস্থান ভারতীয় জরিপ বিভাগের ১৯৪১ সালের 'কোয়ার্টার ইঞ্চ টপোগ্রাফিক মানচিত্রে' পরিষ্কারভাবে চিত্রিত রয়েছে। এ থেকে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না যে, হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূলস্রোত দ্বীপটির পশ্চিম পাশ দিয়েই প্রবাহিত। কিন্তু ভারত এ বিষয়টিকে গায়ের জোরে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত বলে প্রমাণ করতে প্রয়াসী।

দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা প্রশ্নে ভারত 'মধ্যরেখা নীতি'র আশ্রয় নিয়েছে। এ নীতি বিবদমান দু'দেশের সংলগ্ন উপকূলের নিকটতম জলভাগে দেশ দু'টির মাঝে সম-দূরবর্তী স্থানের উপর দিয়ে একটি বিভাজন রেখা টেনে কোন বিতর্কিত ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণের প্রয়াস পায়।

ভারত নিজ আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা নির্ধারণে এ ফর্মূলাটি ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার সাথে প্রয়োগ করেছে। ভারতের গৃহীত এ নীতিতে দ্বীপটি তার অংশে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ভারতের অন্য সকল সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে 'রেডক্লিফ রোয়েদাদ' (Redclief

---

৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৩।

www.pathagar.com

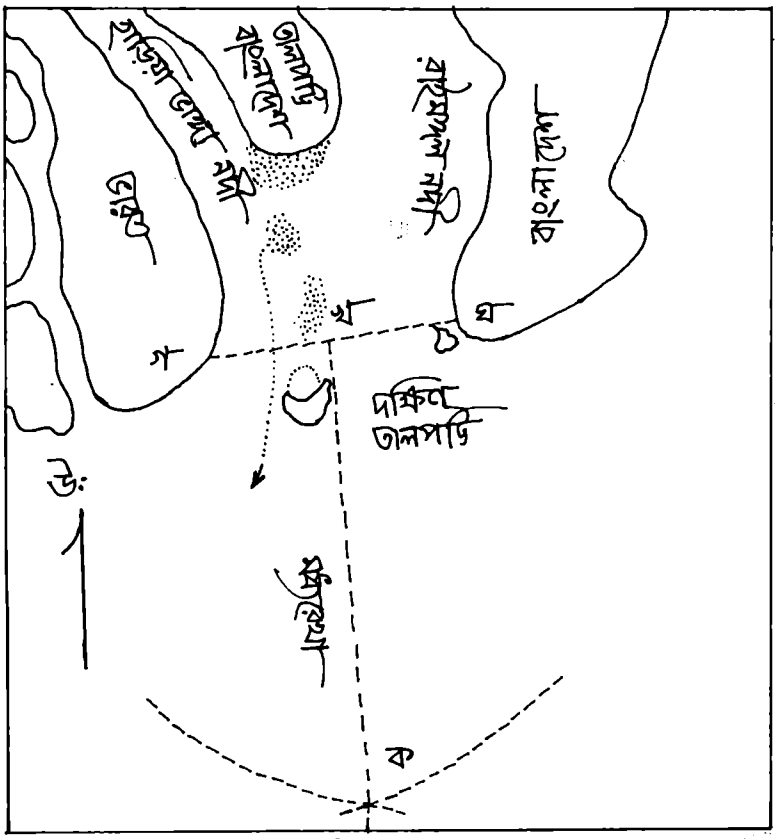

চিত্র-৫

Award, 1947) এর ভিত্তিতে। ওসব বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাধারণতঃ নদী-বিভাজিত সীমান্তে 'নদীর মূল স্রোতধারার মধ্যরেখা' (Mid Channel Flow)-কে দু'দেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।[৮৮] হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূলস্রোতধারা দ্বীপটির পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বাংলাদেশের গৃহীত নীতিতে দ্বীপটি এ অংশেই পড়ে।

---

৮৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১।

www.pathagar.com

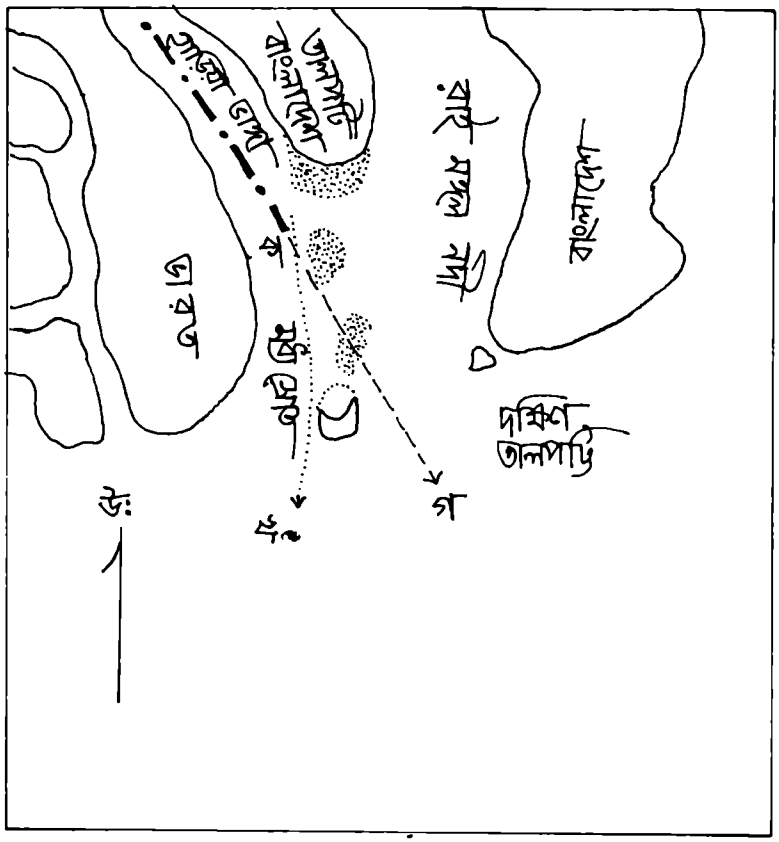

চিত্র-৬

মূলত উপর্যুক্ত দুটি নীতির কোনটিই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন কনভেনশন নয়। তবে বিষয়টি যেহেতু দ্বিপাক্ষিক এবং বাংলাদেশ-ভারতের অপরাপর সীমানা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক বিরোধের মীমাংসা হয়েছে 'রেডক্লিফ রোয়েদাদ'-এর ভিত্তিতে, সেহেতু বাংলাদেশের গৃহীত নীতিকে কোন মতেই অযৌক্তিক বলা যায় না। তাছাড়া বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। দ্বীপটির মালিকানার সাথে জড়িত সম্ভাবনাময় ২৫,০০০ বর্গ কি. মি. আঞ্চলিক সমুদ্র এবং এক লক্ষ বর্গ কি. মি. সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল হারানো এদেশের

www.pathagar.com

জন্য আপন পায়ে কুড়াল মারার শামিল।[৮৯] কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা তার প্রায় ৬০০০ কি. মি. দীর্ঘ উপকূল জুড়ে রয়েছে বিস্তৃত সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল।

ভারত কার্যতঃ বিষয়টিকে যতটা না অর্থনীতিক সুবিধে পাওয়ার দৃষ্টিতে দেখছে তার চেয়ে বেশী দেখছে বাংলাদেশের উপর সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিপাক্ষিক দরকষাকষিতে একটি সুবিধেজনক অবস্থান নেয়ার দৃষ্টিতে। বলা বাহুল্য যে, ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রধান প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দেশ দু'টির জনগণের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের গভীর বন্ধন। তাই এ বিরোধকে ন্যায়পরতার (Equity) দৃষ্টিতে দেখে একটি সুপ্রতিবেশী ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে আশু নিষ্পত্তি করা উভয় রাষ্ট্রের জন্যই হবে কল্যাণকর।

২.১.২ চ. সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিক উদ্যোগ

বাংলাদেশ তার ভূ-রাজনীতিক এবং ভূ-রূপতাত্ত্বিক বাস্তবতার কারণে সমুদ্র সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে সব সময় সাড়া দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উপকূল রেখার দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, অগভীরতা এবং নতুন ভূমি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশের ভিত্তিরেখা নির্ধারণের সমস্যা দেখা দেয়। তাই বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে UNCLOS-III এর কারাকাস বৈঠকে এ প্রসঙ্গে আপত্তি তোলে এবং গভীরতা পদ্ধতির মাধ্যমে ভিত্তিরেখা নির্ধারণের প্রস্তাব প্রদান করে। সম্মেলনে বিষয়টি বিবেচিত হলেও তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এরপর বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে "Territorial Waters and Maritime Zone Act" ঘোষণা করে এবং গভীরতা পদ্ধতিতে আটটি বিন্দু দিয়ে একটি ভিত্তিরেখা নির্ধারণ করে।

বঙ্গোপসাগরের ফানেলাকৃতি এবং স্বল্প গভীরতা সহ অন্যান্য ভূ-রূপতাত্ত্বিক বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল ও মহীসোপান-এর সীমা নির্ধারণ নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার দক্ষ

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪।

www.pathagar.com

পররাষ্ট্রনীতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি চুক্তিভিত্তিক সমাধান হওয়া প্রয়োজন। সমুদ্র আইন কনভেনশন এ সীমা নির্ধারণী বিষয়ে এখনো যথেষ্ট দুর্বলতা এবং আইনের সুস্পষ্টতা না থাকায় বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের অর্থনীতিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মতো সমুদ্র সীমা নির্ধারণ করেছে।[৯০] বাংলাদেশ এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাংলাদেশের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব নয় বৃহৎ শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতের কারণে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নেয়া। বাংলাদেশ এখনো জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত 'ভৌগোলিকভাবে অসুবিধেজনক রাষ্ট্র' (Geographically Disadvantaged States) নয় যদিও বাস্তবে সমুদ্র সীমা নির্ধারণে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত অসুবিধেজনক।[৯১] তাই বাংলাদেশের এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২.১.৩ ছিটমহল সমস্যা

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময়কার ছিটমহল সমস্যাটি দীর্ঘদিন দু'দেশের রাজনীতিতে বেশ অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। দেশ বিভাগের সময়ে ৯৫টি পাকিস্তানী তালুক রয়ে যায় ভারতে এবং ভারতের ১৩০টি তালুক রয়ে যায় পাকিস্তানে। এ অঞ্চলের শাসন প্রশ্নেই দেখা দেয় এ ছিটমহল সমস্যা। ভারতের কোচবিহার জিলাধীন ৯৫টি তালুকের আয়তন ১২১৫২ একর এবং বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান) রংপুর জিলাধীন ১৩০টি তালুকের আয়তন ২০,৯৫৭ একর।[৯২] ১৯৪৭ সালে দু'দেশের সীমানা জরিপের কাজ চলে কিন্তু এ ছিটমহলগুলো সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ১৯৫৮ সালে নুন-নেহেরু চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহলগুলো পাকিস্তান ও ভারতে মিশিয়ে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের নিকট বেরুবাড়ী হস্তান্তর নিয়ে ভারতে আন্দোলন শুরু হলে

---

৯০. দেখুন, M. Habibur Rahaman, *'Delimitation of Maritime Boundaries : Some Pertinent Issues for Bangladesh'*, প্রাগুক্ত।

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১৭।

৯২. P. P. Karan, *'Indo-Pakistan Boundaries : Their Fixation, Functions and Problems'*, Indian Geographical Journal, Vol-28, 1953, p-30.

www.pathagar.com

সে চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সীমান্ত চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ১(১২) ধারায় বলা হয় 'ভারতে অবস্থিত ছিটমহলগুলো ভারত এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ছিটমহলগুলো বাংলাদেশ নিয়ে নেবে। বাংলাদেশ কিছু পরিমাণ ভূখন্ড বেশী পেলেও এ জন্য তাকে কোন বিনিময় দিতে হবে না।[৯৩] তবে এ ধারার আওতার বাইরে রাখা হয় বেরুবাড়ী ও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাকে। ১(১৪) নং ধারায় বাংলাদেশের ছিটমহল বেরুবাড়ী ও ভারতে অবস্থিত ছিটমহল দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মধ্যে বিনিময় করা হয়। ভারত দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল দুটি স্থায়ীভাবে বাংলাদেশকে লীজ দেয় এবং যোগাযোগের জন্য ১৭৮ মিটার দৈর্ঘ এবং ৮৫ মিটার প্রস্থ একটি করিডোর প্রদান করার কথা বলা হয়। এ করিডোরের মাধ্যমেই ছিটমহলটি বাংলাদেশের লালমনিরহাট জিলার পাটগ্রামের সাথে যুক্ত হবে। এটিই তিনবিঘা করিডোর নামে পরিচিত। বাংলাদেশ দ্রুত যথাযথভাবে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করলেও ভারত তৎক্ষণাৎ করিডোরটি হস্তান্তর করেনি। সম্প্রতি গত ১৯৯২ সালের ২৬শে জুন ভারত এটি হস্তান্তর করেছে। কিন্তু এ হস্তান্তর নিঃশর্ত নয়। ১৯৮২ সালের ৭ই অক্টোবর চুক্তি মুতাবিক তিনবিঘা বাংলাদেশ পেলেও তার সার্বভৌমত্ব থাকবে ভারত সরকারের হাতে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে যে সুবিধা দেয়া হয় তা হলো-তিন বিঘার উপর দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী ও অন্যান্য সমর সম্ভার নিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে।

২.১.৪ 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন' ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আকৃতি, জনসংখ্যা, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সব দিক দিয়ে অপরাপর রাষ্ট্রসমূহ থেকে উৎকৃষ্টতর। ভারতের এ শ্রেষ্ঠত্বই ভারতকে আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হওয়ার মতো সাহস যুগিয়েছে। ভারত পররাষ্ট্রনীতিতে নিজেকে বিশুদ্ধতর প্রমাণ করার প্রয়াস পেলেও তার কার্যকর নীতি (Operational Policy) আঞ্চলিক সুপার

---

৯৩. *'Indo-Bangladesh Agreement Concerning the Demarcation of Land Boundary'*, New Delhi, 16 May, 1974, Article 1(12, 14), placed in Dr. S. S Bindra, *'Indo-Bangladesh Relations'*. New Delhi, 1982, Appendix-IV.

www.pathagar.com

পাওয়ার হবার ইচ্ছাকে প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে 'বিগ্‌ব্রাদার' সুলভ আচরণ সেসব রাষ্ট্রের মাঝে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার করেছে। ভারতের এ আচরণকেই বিশ্লেষকগণ 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন' (India Doctrin) বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, একটি আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হবার মতো সমস্ত উপাদানই ভারতের রয়েছে। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। এ জনসংখ্যা আলাদাভাবে দু'ট পরাশক্তিরই লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী। এ দেশ বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম সংযুক্ত ভূ-খন্ডের দেশ যা ইউরোপের দুই-তৃতীয়াংশের সমান (রাশিয়া ছাড়া)। এটি বিশ্বের দশম স্থানীয় শিল্প উৎপাদনকারী দেশ। তৃতীয় বিশ্বের মানদন্ডে তার আর্থ-রাজনীতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার জন্যে সে গর্বিত। ভারত মহাসাগরে ভারতের কৌশলগত অবস্থানও অত্যন্ত সুবিধাজনক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ায় যাবার গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ মালাক্কা প্রণালী থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমস্তটাই ভারতের নিয়ন্ত্রণে। তার রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম স্থলবাহিনী, ষষ্ঠ বৃহত্তম নৌবাহিনী এবং অষ্টম বৃহত্তম বিমান বাহিনী। কমিউনিষ্ট ব্লকের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ ভারত। এদেশ তৃতীয় বৃহত্তম সমরাস্ত্র আমদানীকারকও বটে। সে নিজেই ট্যাংক, সুপারসনিক জেট এয়ার ক্র্যাফ্‌ট, হেলিকপ্টার, নৌ ফ্রিগেট ও পদাতিক বাহিনীর সমরাস্ত্র উৎপাদন করতে সক্ষম। ভারতের পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন সাবমেরিন রয়েছে এবং তার বর্তমান কারিগরি যোগ্যতা মাত্র ক'সপ্তাহের ব্যবধানে যথেষ্ট পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করতে সক্ষম। ভারত সামরিক খাতে ব্যয়কারী বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ।[৯৪]

একটি বৃহৎ শক্তি হবার এসব প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকার পরও ভারতের দারিদ্র্যের মাত্রা প্রচন্ড এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পরিমাণও বিপুল। তদুপরি রাষ্ট্রীয় শক্তির বিপুল সম্ভাবনা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মনে বৃহৎ শক্তি হবার

---

৯৪. Iftekharuzzaman, *'The India Doctrine : Relevance for Bangladesh'* in M. G. Kabir and Shaukat Hassan (ed), *'Issues and Challenges Facing Bangladesh Foreign Policy'*, BSIS. 1989, p-19.

www.pathagar.com

উদ্দীপনা দিয়েছে। ভারতের একজন প্রখ্যাত পন্ডিত Baldev Raj Nayar বলেন ঃ

"From the perspective . . . of its size, population, strategic location, the past creativity of its people, its abundant natural resources endowment, most Indians have seen their country as a potential great power. . . It is precisely India's perception of itself as a potential great power—however distant that may seem."[৯৫]

নেহেরু স্বাধীনতার অনেক পূর্ব থেকেই এরূপ একটি ধারণা পোষণ করলেও বিষয়টিকে তিনি নৈতিকতার মুখোশে ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

"A free India with her vast resources, can be a great service to the world and humanity. India will always make a difference to the world; fate has marked us for big things. . . Leaving the (se) three big countries, the United States, the Soviet Union and China aside for the moment, look at the world. There are many advanced, highly cultured countries. But if you peep into the future and if nothing goes wrong, wars and the like—the obvious fourth country in the world is India."[৯৬]

ভারতের এ বৃহৎ শক্তি হবার প্রবণতা যতটা না বিশ্বব্যাপী তদপেক্ষা প্রতিবেশী কেন্দ্রিক, অন্যকথায় আঞ্চলিক। ভারতের প্রখ্যাত সামরিক বিশেষজ্ঞ K. Subrahmanyam যথার্থই বলেন ঃ

"This country, with its population. size, resources and industrial out put will be a dominant country in the region just as the U.S. Soviet Union and China happen to be in

---

৯৫· *প্রাগুক্ত*, পৃ-২০।

৯৬· *প্রাগুক্ত*, পৃ-২১।

www.pathagar.com

their respective areas. This is just a fact of geography, economics and technology[৯৭]

ভারতের এ সমস্ত বক্তব্যের ফলে স্বভাবতঃই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত। তাদের এ শঙ্কা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যখন ভারত ১৯৫০-৫১ সালে এবং ১৯৬১-৬২ সালে গোপনে নেপালে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সংকটে সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং পরবর্তীকালে শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করেছে। মূলতঃ ভারত তার নিরাপত্তার ধারণাকে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার এককের সাথে সংযুক্ত করেছে। অন্ততঃ ১৯৮৭ সালে শ্রীলংকায় এবং ১৯৮৮ সালে মালদ্বীপে বিতর্কিত ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী (IPKE) এর কার্যক্রম তা-ই প্রমাণ করে। ইন্ডিয়া ডকট্রিন এর এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে একজন ভারতীয় পন্ডিত Bhabani Sen Gupta এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"India has no intention of intervening in internal conflicts of a South Asian country and it strongly opposes any intervention by any country in the internal affairs of any other. India will not tolerate an external intervention in a conflict situation in any South Asian country if the intervention has any implicit or explicit anti-Indian implication. No South Asian government must, therefore, ask for external military asistance with an anti-Indian bias from any country. If a South Asian country genuinly needs to deal with a serious internal conflict situation it should ask help from neighbouring countries including India. The exclusion of India from such a contingency will be considered to be an anti-Idian move on the part of the government."[৯৮]

---

৯৭ K. Subrahmanyam, *'Indian Security Perspectives.'* New Delhi, quoted in Iftekharuzzman, প্রাগুক্ত, পৃ-২১।

৯৮ Bhabani Sen Gupta, *The India Doctrine.'* India Today, 31 August 1983, quoted in Iftekharuzzaman, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

www.pathagar.com

ভারতের কৌশলগত নিরাপত্তার তিনটি ধারণা হলো ঃ

i) "ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা সংরক্ষণ।

ii) ভারতীয় উপমহাদেশের যে কোন অঞ্চলে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ।

iii) ভারত মহাসাগরের উপর নিয়ন্ত্রণ।"[৯৯]

উপরিউক্ত ধারণা তিনটির প্রথম ও প্রধান ধারণাটি হলো 'ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা' রক্ষা করা। এ বিষয়টি বিশেষতঃ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রধানতঃ আধুনিক সভ্যতার প্রাণ বলে বিবেচিত 'খনিজ তেল' ও কয়লার জন্য। ভারতের তেল চাহিদার অধিকাংশই এ অঞ্চল থেকে পূরণ করা হয়। তাছাড়া এ অঞ্চলের পলল ভূ-খন্ডে অন্যান্য খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। তাই এ অঞ্চল ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। ভারত যে কোন মূল্যে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ অঞ্চলের সাথে তার মূল ভূ-খন্ডের যোগাযোগের একমাত্র পথ কেবল ১৪ মাইল ব্যাপী শিলিগুড়ি করিডোর। এ করিডোরের উত্তরে রয়েছে বিরোধী চীন এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ। কোলকাতা বন্দর ছাড়া এ অঞ্চলের নিকটবর্তী ভারতের আর কোন সমুদ্র বন্দর নেই যা দিয়ে সমুদ্র পথে যোগাযোগ করা যেতে পারতো। '৪৭-এ স্বাধীনতার পর হতেই ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞগণ ভবিষ্যতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাথে কোন সামরিক বিরোধের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের ভাগ্য নিয়ে সর্বদা ভীত ছিলেন। এ অঞ্চলে ভারতের উপর চীনের কৌশলগত সুবিধা ছিল। সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্তী চুম্বী উপত্যকার অবস্থান ছিল তিব্বত অঞ্চলের একফলা ছুরির মত। এ সুবিধাজনক স্থান থেকে চীনের দক্ষিণমুখী যে কোন অভিযান ভারতের জন্য ছিল বিপজ্জনক। এ দিক দিয়ে ৮০ মাইলেরও কম যে কোন অভিযান ভুটান, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ, সমগ্র আসাম এবং অন্যান্য পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।[১০০] অপর দিকে '৭১-র পূর্ব পর্যন্ত করিডোরটির

---

৯৯. Shelton U. Kodikara, *'Strategic Factors in Interstate Relations* in South Asia 1991, quoted in Md. Nuruzzaman, *'National Security of Bangladesh : Challenges and Options'*, BSIS Journal, Vol-12, No.3, 1991, p-394.

www.pathagar.com

দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল শত্রুভাবাপন্ন পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) অবস্থান। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভারতের বিপুল আগ্রহের কারণ ছিল এ অঞ্চলে একটি মিত্র দেশ প্রতিষ্ঠা করা যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূ-রাজনীতিক দুর্বলতাকে খানিকটা সংহতি দেবে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের পরবর্তী আচরণে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম প্রদেশ দু'টিতে প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝিতে মারাত্মক রূপ নিলে ভারত সরকার বাংলাদের সরকারকে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের অনুরোধ জানায় যাতে বিদ্রোহীরা বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে না পারে।[১০১] সুতরাং এ কথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে, বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই ভারত তার ভূ-রাজনীতিক স্বার্থ হাসিল করতে পারলেও এ দেশের নিরাপত্তা তখন থেকেই একটি হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। প্রসঙ্গত ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের সুবিধাসমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে K. Subrahmanyam এর মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন ঃ

"There is not the same risk of Chinese cutting of Assam as there was in 1962, since in the course of hostilities, the northern Bngladesh is likely to be overrun by the Indian forces, and the communication lines with Assam will be broadened rather than narrowed down or closed."[১০২]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তিনি আরো দৃঢ়তার সাথে বলেন ঃ

"This country needs no longer be afraid that in case of

১০০· Akmal Husain, *'Geopolitics and Bangladesh Foreign Policy.'* CLIO. 1989, p-98.

১০১· Shaukat Hassan, *'India Factor in the Bangladesh Foreign Policy'*, in M. G. Kabir and Shaukat Hassan (ed), *'Issues and Challenges Facing Bangladesh Foreign Policy'*, BSIS, 1989, p-52.

১০২· K. Subrahmanyam, *Bangladesh and India's Security*, Palit and Dutt, Dehra Dun, 1972, quoted in Akmal Hosain, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৯৮।

www.pathagar.com

military pressure from China, Assam will be cut off from the rest of India."[১০৩]

স্বাধীনতার পর হতেই বাংলাদেশের রেল ও অভ্যন্তরীণ পানিপথ ভারতের দু'অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে ভারত মালামালের দ্রুত পরিবহণ এবং স্বল্প খরচের সুবিধা পাচ্ছে। প্রথমদিকে ভারতের নীতি নির্ধারকগণ চট্টগ্রাম বন্দরকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ সমূহের ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করলেও শেষ পর্যন্ত তারা তা ব্যবহার করেনি, যদিও তা ভারতের জন্য এখনো গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোলকাতা বন্দরের কোন সংকটকালে ভারত চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।[১০৪]

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তিটিও বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। চুক্তির দশ নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় ঃ

"In a case either party is attacked or threatened with attack, the high Contracting parties shall immediately enter into mutual consulations in order to take appropriate effective measures to eliminate the threat and thus ensure the peace and security of their countries."[১০৫]

অর্থাৎ 'যে কোন ধরনের আক্রমণের হুমকি এলে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পক্ষগণ যথাশীঘ্র সম্ভব পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সে হুমকি প্রতিহত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।' যেহেতু বাংলাদেশ তিন দিক দিয়ে ভারত পরিবেষ্টিত এবং এক দিকের সামান্য অংশে মায়ানমার-এর সাথে সাধারণ সীমান্ত, সেহেতু বাংলাদেশকে এ দুটো দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের আক্রমণ বা হুমকির মুকাবিলা কতে হবে না। কিন্তু ভারত চীনের আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। যদি কখনো চীন ভারত আক্রমণ করে ও শিলিগুড়ি

১০৩· *প্রাগুক্ত*, পৃ-৯৮।

১০৪· Akmal Hosain, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৯৯।

১০৫· *'Indo-Bangladesh Treaty of Cooperation, Friendship and Peace.'* 19 March, 1972, Placed in Dr. S. S. Bindra, *'Indo-Bangladesh Relations.'* 1982. Appendix-1.

www.pathagar.com

করিডোর বন্ধ করে দেয় তবে ভারত চুক্তিমতে বাংলাদেশের ভূ-খন্ড ব্যবহারের দাবী করতে পারে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতের শত্রুকে নিজের শত্রু ভাবতে বাধ্য। ১৯৭৫ এর আগস্টের পর হতে চীন-বাংলাদেশ সৌহার্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ যদি চুক্তির ঐ অনুচ্ছেদ পালন করে তবে তাকে যুদ্ধে চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে সহযোগিতা করতে হবে, যা হয়তো কূটনীতিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যদি ভারতীয় বাহিনীকে বিবাদপূর্ণ এলাকায় গমনাগমনের সুযোগ দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে তবে ভারত এ ইস্যুতে শক্তি প্রয়োগ করেত পারে।[১০৬] একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান ও ভারত-মায়ানমার যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

'ইন্ডিয়া ডকট্রিন'-এর আর একটি বড় ধরনের প্রয়োগ হতে পারে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণ নিয়ে যার প্রয়োগ ইতোমধ্যেই হয়েছে দক্ষিণ তালপট্টিতে। দক্ষিণ-তালপট্টি দ্বীপটি বিভিন্ন বিচারে বাংলাদেশের মালিকানাভুক্ত হওয়ার দাবী রাখে (পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) কিন্তু ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে নিজ দখলে রাখার চেষ্টা করছে। কেবল দক্ষিণ এশিয়াই নয় ভারতের নৌবাহিনী এখন বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম নৌবাহিনী। তাছাড়া তার পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিনও রয়েছে। বঙ্গোপসাগরসহ ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌশক্তির এ অবস্থান প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য স্বভাবতঃই হুমকিস্বরূপ। এ ব্যাপারে ভারতের বিগ্‌ব্রাদার সুলভ আচরণের ধারণা খুবই স্পষ্ট। K. Subrahmanyam ১৯৭২ সালের মে মাসে বলেন ঃ

"The main responsibility for ensuring the security of the countries on the shores of the Bay of Bengal from the external maritime intervention will be India's"[১০৭]

১০৬· Akmal Hosain, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৯৯।

১০৭· Shaukat Hassan, *'The India Factor in the Foreign Policy of Bangladesh'* in M. G. Kabir and Shaukat Hassan (ed), প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯।

www.pathagar.com

এ কারণেই ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মার্কিন রণতরী ত্রাণ সাহায্য দিতে এলে ভারত তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলো।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের ২৫৬৬ কি· মি· ব্যাপী সাধারণ সীমান্ত 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন'-কে বাংলাদেশের জন্য আরো বেশী প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব দিয়েছে। সীমান্ত নির্ধারণী বিরোধ ছাড়াও কাঁটাতারের বেড়া এবং অতি সাম্প্রতিক পুশ ব্যাক (এ সম্পর্কে পরে আলোচিত হয়েছে) বাংলাদেশে-ভারত বিরোধের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে। বাংলাদেশী কূটনীতিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করছেন কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের নামে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তের নিকটে সামরিক স্থাপনা নির্মাণ করছে। কোলকাতার 'আনন্দবাজার' পত্রিকার ২০শে অক্টোবর '৯২ সংখ্যার ভাষ্য অনুযায়ী 'ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া ও পাকা সড়ক নির্মাণ কাজ আগামী ডিসেম্বর নাগাদ শেষ হবে এবং এ জন্যে ৪০৮ কোটি রূপী বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের অতি নিকটে সুউচ্চ ওয়াচিং টাওয়ার (Watching Tower) নির্মাণ করেছে যা সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর তিক্ততা ও নিরাপত্তা ভীতির জন্ম দিয়েছে। কোন কোন বিশ্লেষক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কথিত 'শান্তি বাহিনী' তৎপরতায় ভারতীয় ইন্ধন রয়েছে বলেও মনে করেন।

ভারত 'অপারেশন পুশ ব্যাক'-এর নামে বাংলাভাষী মুসলমান নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার এক অশুভ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে যা দু' দেশের সম্পর্কে অবনতির ক্ষেত্রে আবারো চিড় ধরিয়েছে। ভারত দাবী করছে ওসব লোকেরা বাংলাদেশী এবং ভারতে অবৈধ অবস্থানকারী। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ এদের 'বাংলাদেশী নাগরিক' হিসেবে গ্রহণ করার মতো কোন প্রমাণ পায়নি। আর তাই তাদেরকে গ্রহণ করতেও নারাজ। বাংলাদেশ থেকে কথিত অনুপ্রবেশ রোধে ভারতের এ সিদ্ধান্ত বস্তুতপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোই এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করেছে। 'আনন্দবাজার' পত্রিকা ৫ই সেপ্টেম্বর '৯২ সংখ্যায় সীমান্তবর্তী ৭টি রাজ্যের গত চার দশকের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ দশকে ভারতের

www.pathagar.com

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় ২৩·৫০ শতাংশ। পক্ষান্তরে এ দশকে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪·৫৫ শতাংশ। '৫১-'৬১, '৬১-'৭১, '৭১-'৮১ এই দশকগুলোতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২১·৫১, ২৪·৮০ ও ২৪·৬৬ শতাংশ। একই দশকগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮·৮০, ২৬·৮৭ ও ২৩·১৭ হারে জনসংখ্যা বেড়েছে। এ বৃদ্ধির হার জাতীয় বৃদ্ধির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ- একথা আদমশুমারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে ভিন্ন দেশ থেকে জনসংখ্যার স্রোত সে দেশে প্রবেশ করলে তারা গেল কোথায়? মূলতঃ এ সবই ভারতের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা ও কার্যক্রম। কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন ভারতের এ পদক্ষেপ কার্যতঃ বাংলাদেশকে ভারতের নিকট গ্যাস বিক্রি করতে রাজনীতিক চাপ প্রয়োগের একটি কৌশল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় প্রচন্ড জ্বালানী সংকট চলছে। এজন্যে ভারতীয় শাসকদের শ্যেন দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের গ্যাসের দিকে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি হাজার কোটি টাকার উপরে। ১৯৯১-৯২ সালে ভারত-বাংলাদেশ থেকে আমদানী করে ১৬ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য এবং বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করে ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য।[১০৯] সুতরাং এ অসম বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের অজুহাতে ভারত-বাংলাদেশের গ্যাস কিনতে চাইছে। কিন্তু বাংলাদেশ গ্যাসের স্বল্প মজুত, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি, নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠার সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণে ভারতের নিকট গ্যাস বিক্রি করতে রাজী হয়নি।

ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলো নিয়ে দিল্লী প্রশাসন সব সময়ই অত্যন্ত চিন্তিত থেকেছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। এরা ভারতের ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো থেকে আলাদা থাকতে চায়। নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম-এর বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের সাথে সম্প্রতি যোগ হয়েছে 'ঝাড়খন্ড আন্দোলন'। ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ঠেকাতে পারেনি। আর তাই সেখানে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রোধ করতে হচ্ছে সরকারকে। এ ক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রসদ সরবরাহ করা।

---

১০৮. *পাক্ষিকপালাবদল*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৬-৩১ অক্টোবর, ঢাকা ১৯৯২।

১০৯. *দৈনিকসংবাদ*, ৩০ জুন, ১৯৯২।

www.pathagar.com

এটি আঁচ করেই ভারত এখন রেলপথে রসদ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করতে চাইছে।[১১০] বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক। কোন বিবেকবান সরকারের পক্ষেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এতে করে সাধারণের মাঝেও তীব্র অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশ এ ধরনের সিদ্ধান্তে রাজী না হওয়ায় ভারত 'অপারেশন পুশ ব্যাক' এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে বাধ্য করতে চাইছে বলে কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন।

২.২ বাংলাদেশ-মায়ানমার

ভারতের পর বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অপর রাষ্ট্রটি হলো মায়ানমার। এর সাথে বাংলাদেশের ১৭৬ কি. মি. ব্যাপী সাধারণ সীমান্ত রয়েছে। এ সীমান্ত বাংলাদেশে সর্ব দক্ষিণ-পূর্বাংশে কক্সবাজারকে মায়ানমার-এর আরাকান প্রদেশ ও চিন প্রদেশ হতে বিভক্ত করেছে। এদেশের ভূ-রাজনীতিতে দ্বিতীয় প্রধান প্রভাবশীল বিষয় মায়ানমার।

বাংলাদেশের সাথে মায়ানমার-এর দীর্ঘদিনের শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সীমান্তের এ অংশ নিয়ে এ দেশকে ১৯৭৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত খুব একটা উদ্বিগ্ন থাকতে হতো না। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষকগণ একে 'শান্তিপূর্ণ সীমান্ত' বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু বাংলাদেশের এ সীমান্তে ১৯৭৮ সালের উদ্বাস্তু সমস্যা ও বর্তমান নতুন করে সৃষ্ট রোহিঙ্গা সমস্যা সে ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। ইতোপূর্বে কৌশল বিশারদগণ (Srategists) এখানকার ভূ-রাজনীতিতে মায়ানমারকে যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও অধুনা সৃষ্ট রোহিঙ্গা সংকটের ফলে তা এখন একটি ভাইটাল পয়েন্ট।

১৯৭৮ সালে 'অপারেশন গেলন' ও 'শিউ হিনথা'-র নামে মায়ানমার সামরিক সরকার দেশের দক্ষিণ পশ্চিম মুসলমান প্রধান প্রদেশ আরাকানের ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতনের শিকার বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে আশ্রয়ের জন্যে আসে। এ থেকে মূলতঃ শুরু হয় মায়ানমার-বাংলাদেশ উদ্বাস্তু সংকট '৭৮। নির্যাতনের শিকার জনগোষ্ঠী 'রোহিঙ্গা' নামে পরিচিত। ১৯৭৮ সালের এ রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের কূটনীতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে একই

১১০. *পাক্ষিক পালাবদল*, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বছর ৩১ শে আগস্ট সম্পাদিত উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন চুক্তি অনুযায়ী সকল উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। এরপর দু'দেশের অভিন্ন সীমান্তকে ১৯৭৯ সালে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নাফ নদীর মোহনা বিন্দু থেকে শুরু করে উত্তরে বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত সংযোগস্থল পর্যন্ত ১৭৬ কি. মি. পর্যন্ত এ সীমান্ত বিস্তৃত। ১৯৭৯ সালের এ স্থল-সীমান্ত চুক্তিকে সীমান্ত নির্দেশক পিলার দিয়ে ১৯৮৫ সালে বাস্তবায়ন করা হয়। কোন প্রকার সীমান্ত বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও দু'দেশের সম্পর্ক আজ সংঘাতমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কারণ ছাড়াই উস্কানিমূলকভাবে ১৯৯১ এর ২১শে ডিসেম্বর সকালে মায়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'লুনথিন' সীমান্তের 'নো ম্যানস ল্যান্ড' থেকে তিন মাইল ভেতরে বাংলাদেশের রেজুপাড়া বিডিআর ফাঁড়িতে হঠাৎ আক্রমণ করলে দু'দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে। মায়ানমার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকে। আর এই সাথে চলে 'রোহিঙ্গা' বিতাড়ন অভিযান।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দুই লাখের বেশী 'রোহিঙ্গা' উদ্বাস্তু হিসেবে অবস্থান করছে। অর্থনীতিকভাবে দুর্বল বাংলাদেশের পক্ষে এ বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তুদের খরচ বহন করা অত্যন্ত কঠিন। বিপুল জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নিজেরই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলবার ক্ষমতা নেই; তার উপর এ উদ্বাস্তু জনস্রোত নিঃসন্দেহে এ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্যে এক মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। বিষয়টি যেন অনেকটা মরার উপর খাড়ার ঘা। এটি যে কেবল এ দেশের অর্থনীতির জন্যেই চাপ সৃষ্টি করছে তা নয়; এটি 'গণতান্ত্রিক শিশু রাষ্ট্রের রাজনীতিক স্থিতিশীলতার জন্যেও একটি মারাত্মক নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশ বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতিতে বিশ্বাসী। মায়ানমার সাধারণ সীমান্তকে যেভাবে সামরিকীকরণ করছে তাতে হয়তো বা বাংলাদেশ অনাঙ্খিত কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে যার ব্যয়ভার এ দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা অনেকটাই অসম্ভব। উদ্বাস্তু জনগণ ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। কোন কোন বিশ্লেষক এ প্রক্রিয়াকে বাংলাদেশের জন্য একটি 'ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন' (Demographic Invasion) বলে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত করেছেন।

আরাকানে বসবাসকারী মুসলমান জাতি 'রোহিঙ্গা'দের নিয়েই বর্তমান উদ্বাস্তু সমস্যার জন্ম। আরাকান মায়ানমারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। নাফ, কালাদান, মাউই, লেম্বু প্রভৃতি নদ-নদী বিধৌত এর বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া দক্ষিণ দিকে রয়েছে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগর। মায়ানমারের মোট জনসংখ্যা ৪২,৫৬,১০০০ জন। এর মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক বাস করে এ আরাকান প্রদেশে। আরাকানের ৭০ শতাংশ লোক রোহিঙ্গা মুসলমান, ২৩ শতাংশ বৌদ্ধ মগ; অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে কারেন, ম্রোস, কেমিস, চাকমা, তা প্রভৃতি।[১১১] মূলতঃ সমগ্র মায়ানমারে প্রায় ১২৬টি জাতি গোষ্ঠীর বাস। এদের মধ্যে বর্মী ৬৯%, শান ৮·৫%, কারেন ৬·২%, রাখাইন ৪·৫%, মন ২·৪%, কাচিন ১·৪% এবং অন্যান্য ৫·৮%।[১১২] এ জাতিগুলোর অধিকাংশই পার্বত্য উপজাতি। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি। কয়েকটি ভাষার লেখ্যরূপ থাকলেও অধিকাংশ ভাষারই লেখ্যরূপ নেই।[১১৩] এ জাতিগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একত্রে বসবাস করলেও এক দেহে লীন হয়নি। নৃতত্ত্বের সম্মিলন তত্ত্ব (Melting pot) এখানে কার্যকর হয়নি। মায়ানমারের শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নত নয়। ফলে এ জাতিগুলোর মধ্যে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি। মায়ানমারের এ অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই বিশেষতঃ সামরিক জান্তাকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করছে। জাতিগুলোর মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনেই সরকার বিশেষতঃ ব্যস্ত।

থাইল্যান্ডের সীমান্তে কারেন বিদ্রোহী, মায়ানমার উত্তর-পশ্চিমাংশ কাচিন বিদ্রোহী ও ভারতীয় নাগাল্যান্ড সীমান্তে নাগা বিদ্রোহীরা মায়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশের সীমান্তের নিকটে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে 'রোহিঙ্গা' জাতি। এ সমস্ত কারণে মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক পরিস্থিতি যখন ঘোলাটে তখন অংসান সুকীর নেতৃত্বে সেখানে চলে গণতন্ত্রের

১১১· *পাক্ষিকপালাবদল*, ২য় বর্ষ, ১০ম বর্ষ, ১৬-৩১ অক্টোবর ঢাকা, ১৯৯২।

১১২· *Encyclopaedia Britannica*, 1992, Book of the Year.

১১৩· *Encyclopaedia Britannica*, Vol-3.

www.pathagar.com

আন্দোলন। এ আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং জনগণের আস্থা অর্জন করে। ১৯৯০ এর মে মাসের নির্বাচনে 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসী' (National League for Democracy) ৮০ শতাংশ আসনে বিজয়ী হয়। কিন্তু সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজীতো হয়নি বরং তাদের উপর চালায় নির্যাতনের স্টীম রোলার। এমনি বিশৃংখল পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে জনগণকে ভিন্ন পথে চালিত করবার জন্যে মায়ানমার নতুন করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে আত্মনিয়োগ করে। বাংলাদেশে ২১ ডিসেম্বর '৯১-এ লুনথিন বাহিনীর হামলা ও রোহিঙ্গা বিতাড়ন তারই ধারাবাহিকতা।

বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমন এবং উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তা উত্থাপিত হয়। এতে বাংলাদেশ আশাব্যঞ্জক সাড়াও পায়। এর ধারাবাহিকতায় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে গত জুন মাসে উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু মায়ানমার চুক্তিটির বাস্তবায়নে ক্রমাগত টালবাহানা করছে।

বিষয়টি এবার ভূ-রাজনীতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যাক। বাংলাদেশ ও মায়ানমার উভয়েই একই এশীয় আঞ্চলিক ব্যবস্থার অধীন অবস্থান করছে। এ অঞ্চলের সংকট সমাধানে তাই এশীয় রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা বেশী হবে এটিই স্বাভাবিক। এতদঞ্চলের দু'টি বৃহৎ শক্তি হলো চীন ও ভারত। বাংলাদেশের সাথে এদের একটির সাধারণ সীমান্ত রয়েছে। বিপরীত পক্ষে মায়ানমারের সাথে উভয় শক্তিরই সুবিস্তৃত সাধারণ সীমান্ত রয়েছে। মায়ানমার উত্তর-পূর্বাংশে চীনের সাথে এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে ভারতের সাথে সাধারণ সীমান্তে অবস্থান করছে। এ অঞ্চলের সমস্যার সমাধানে আঞ্চলিক শক্তির বাইরের কোন শক্তিকে আহবান জানালে বা তার সহযোগিতা গ্রহণ করলে আঞ্চলিক শক্তিসমূহ বিরাগভাজন হবে এটিই সঙ্গত। হয়তো 'রোহিঙ্গা সমস্যা'-র সমাধানে বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু তা জন্ম দিতে পারে অপরাপর বহুবিধ আঞ্চলিক বিরোধের। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আঞ্চলিক শক্তি শূন্যতা পূরণে দু'টি পরস্পর বৈরী রাষ্ট্র চীন ও ভারত উভয়ে সচেষ্ট হলেও এ অঞ্চলে মার্কিন হস্তক্ষেপকে

www.pathagar.com

তারা যে কখনো নেক নজরে দেখবে না এমনটি অবাস্তব নয়। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই মায়ানমারের উপর অর্থনীতিক অবরোধ করলেও তা যতটা না মানবিক তার চেয়ে অনেক বেশী রাজনীতিক ও অর্থনীতিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের অনুসারী। স্বভাবতঃই পরাশক্তি হিসেবে সে তার রাজনীতিক মতাদর্শের প্রতিফলন সমগ্র বিশ্বে দেখতে চাইবে। গণতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকায় গণতন্ত্রের প্রসার প্রকারান্তরে পুঁজিবাদেরই প্রসার। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় এখন মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের চেয়ে অর্থনীতিক দ্বন্দ্বই অধিকতর কার্যকরী। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট তার বর্তমান অর্থনীতিক দৈন্যদশা কাটাতে যে গণতন্ত্রের প্রসার চাইবে এটাই স্বাভাবিক। তাই মায়ানমারে গণতন্ত্রায়নের উদ্দেশ্যে অর্থনীতিক অবরোধের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টির পেছনে এ ধরনের মার্কিন উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকতে পারে বলে কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে এ ধরনের কোন স্বার্থ না থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ততটা সহানুভূতি সম্পন্ন নয়। আর হলেও এর সমাধানে মার্কিন উদ্যোগ হবে অত্যন্ত ব্যয় বহুল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। সে এখন পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন চীনকে অসন্তুষ্ট করতে চাইবে না। চীন এখন তার একটা উত্তম বাজারও বটে। তাছাড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো ভুলে যায়নি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে তার পরাজয় সেদেশের কৌশল বিশারদদের (Stratagists) মনে সমগ্র দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া সম্পর্কেই একটা ভীতির সঞ্চার করেছে। তদুপরি ভিয়েতনামের চেয়ে মায়ানমারের ভৌগলিক বৈশিষ্টও যুদ্ধের জন্য অধিক বিপদজনক। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে মায়ানমারের সাথে কোনরূপ যুদ্ধে যাবে না বা সরাসরি হস্তক্ষেপে যাবে না একথা অনেকটা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়।

এদিকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে চীন বাংলাদেশের চেয়ে মায়ানমারকেই অধিক গুরুত্ব দিতে পারে তার অর্থনীতিক প্রয়োজনে। চীন তার সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রে অস্ত্রের এরূপ উত্তম বাজারকে নষ্ট করতে নাও চাইতে পারে। কেননা মায়ানমার সাধারণ সীমান্ত দিয়ে প্রতি বছর চীন থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে থাকে।

এ অঞ্চলের অপর শক্তি হলো ভারত। ভারত বাংলাদেশের 'রোহিঙ্গা সমস্যায়' মায়ানমারের আচরণের নিন্দা করেছে। কিন্তু ভারত সরাসরি তার

www.pathagar.com

সাথে সংকট নিরসনে সশস্ত্র সংঘর্ষে নাও যেতে পারে। কেননা ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে মায়ানমারের সাথে বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণ সীমান্ত রয়েছে। ভারতের এ অঞ্চলে বর্তমানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তীব্র অথচ তা নিরসনে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ অপ্রতুল। ভারত এ মুহূর্তে মায়ানমারকে উত্তেজিত করলে মায়ানমার ভারতের সীমান্ত দিয়ে নাগা বিদ্রোহী ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের নিকট অস্ত্র সরবরাহসহ ব্যাপক উত্তেজক কর্মকান্ডে সহযোগিতা করতে পারে যা ভারতের জন্য হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে তাকে বাংলাদেশ 'রোহিঙ্গা সমস্যা' সমাধানে আমন্ত্রণ জানালে সে (ভারত) আসতেও পারে। এ ক্ষেত্রে ভারত যে সুবিধা পাবে তা হলো বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে নিজ সামরিক অভিযান পরিচালনা যা কেবল রোহিঙ্গা সমস্যাই নয় অধিকন্তু তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি প্রদেশের উপর নিয়ন্ত্রণও সুদৃঢ় করতে পারবে। কিন্তু তার এ অভিযান বাংলাদেশের জন্য শ্রীংলকার ন্যায় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। কেননা ভারতের 'বিগব্রাদার' সুলভ আচরণের বিষয়টি ইতোমধ্যেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার করছে। তাছাড়া বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিটি তার কর্মকান্ডকে একটি যৌক্তিক রূপ দেবে। সুতরাং 'রোহিঙ্গা সমস্যা' সামাধানের জন্য যে কোন আঞ্চলিক বা সরাসরি পরাশক্তি কেন্দ্রিক সামরিক উদ্যোগই বাংলাদেশ-মায়ানমার ভূ-রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিপক্ষে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। সেইসাথে এও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, চলমান বাংলাদেশ-মায়ানমার সংকট নিছকই রাজনীতিক সংকট, সামরিক সংকট নয়। এ ক্ষেত্রে সৃজনশীল কূটনীতিই পারে সমাধানের পথ নির্দেশ করতে। একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান বাংলাদেশের জন্য বিপুল কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

সমুদ্র সীমা নির্ধারণী প্রশ্নে মায়ানমার বাংলাদেশের সংলগ্ন রাষ্ট্র (Adjecent State)। বঙ্গোপসাগরের ফানেলাকৃতি এবং বাংলাদেশের উপকূলের অবতল আকৃতি (Concave Nature) উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সমুদ্র সীমা নির্ধারণে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ যদি তার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের ভিত্তিরেখা বিন্দু হতে সোজা দক্ষিণ দিকে সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল ও মহীসোপান অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করে তবে তা মায়ানমারের আরাকান উপকূলের আঞ্চলিক সমুদ্র ও উল্লেখিত দু'অঞ্চল ছাপিয়ে যায়। মায়ানমারের উপকূল রেখা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত। এটি বঙ্গোপসাগর হতে শুরু করে দক্ষিণে মার্থাবান উপসাগর হয়ে আন্দামান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই হিসেবে সমুদ্র

www.pathagar.com

অঞ্চলের পরিমাণও তার প্রচুর। কিন্তু বাংলাদেশের মাত্র ৩১০ কি. মি. বিস্তৃত উপকূল। তাই সমুদ্রাঞ্চলের পরিমাণ অত্যন্ত কম। তবে বাংলাদেশের নিকট এ অঞ্চলের গুরুত্ব অনেক বেশী (পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। এ স্বল্প সমুদ্রাঞ্চলই যখন আবার দ্বৈত সীমা নির্ধারণী সংকটের মধ্যে পড়ে তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে ন্যায়পর নীতি (Equity)-র ভিত্তিতেই তার সমাধান প্রয়োজন। মায়ানমারকে উত্তেজিত করলে সে বাংলাদেশের এই 'ভৌগোলিক্ অসুবিধাজনক' অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশ-মায়ানমার একে অপরের নিকটতম অর্থনীতিক বাজার। বাংলাদেশ স্বল্প মূল্যে ও স্বল্প খরচে মায়ানমারের সাথে বাণিজ্য করতে পারছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন চাল মায়ানমার থেকে আমদানী করেছিল। এরপর যখনই বাংলাদেশের নগদ অর্থে চাল আমদানী করার প্রয়োজন হয়েছে বাংলাদেশ ঐ দেশকে সহজ বাজার হিসেবে বেছে নিয়েছে। ১৯৭৯-৮০ অর্থ বছরে বর্মী চাল ক্রয়ের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ মেট্রিক টন। মায়ানমারে বাংলাদেশের রপ্তানী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল পাটজাত পণ্য, নিউজপ্রিন্ট ও কাগজ। বাংলাদেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে এই বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ যে শুধু তার রপ্তানী পণ্যের একটি বাজার হারাবে তাই নয় চাল আমদানীর জন্য তাকে দূরবর্তী কোন রাষ্ট্রে যেতে হবে আর তাতে পরিবহন খরচ বাড়বে বহুগণ। সুতরাং বাংলাদেশের জন্যে এ নিকটতম বাজারের ভূ-রাজনীতিক ও অর্থনীতিক গুরুত্বও অপরিসীম।

এখন আমরা নেপাল ও শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। একথা সত্য যে ভারতের পরাশক্তি সুলভ মনোভাব অপরাপর দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর (যেমন নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ) মাঝে নিরাপত্তাভীতির জন্ম দিয়েছে। যার ফলে ভারতের প্রতিবেশী সব রাষ্ট্রই আজ এ ইস্যুতে ভারত বিরোধী এক ধরনের ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলা যায়। একটি ছোট ও দরিদ্র দেশ হিসেবে তাই বাংলাদেশকেও তার নিরাপত্তা প্রশ্নে অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার যথেষ্ট ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

নেপাল ঃ বাংলাদেশের সাথে নেপালের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নিরাপত্তা প্রশ্ন

www.pathagar.com

ছাড়াও অপরাপর কিছু বিষয় নিয়ে জড়িত। শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশে পানির অভাব দৃষ্ট হয়। এটি আরো প্রকট রূপ ধারণ করে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধের কারণে, যা পূর্ব আলোচিত হয়েছে। আর তাই বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের সাথে সম্মিলিতভাবে নেপালে সাতটি ড্যাম নির্মাণে আগ্রহী। এ প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ উল্লেখিত ড্যামগুলোর মাধ্যমে সময়মতো প্রাকৃতিক নদী-খাল দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহিত করে স্বীয় অভাব মেটাতে পারবে। অন্যদিকে নেপালের তরাই অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রবাহও বাংলাদেশের পানির চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। তরাই অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত খাল কেটে এ পানি প্রবাহিত করা সম্ভব। এতে নেপালও সমুদ্রে যাওয়ার একটি আন্তর্জাতিক নৌ চলাচল পথ পাবে। ফলে ভারতের উপর তার একচেটিয়া নির্ভরশীলতাও অনেকাংশে হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ এ আন্তর্জাতিক নৌ চলাচল পথ সৃষ্টি করে প্রচুর শুল্কও অর্জন করতে পারবে। সেইসাথে সাতটি ড্যামের পানির নিয়ন্ত্রণকারী নেপালও বাংলাদেশকে ড্যামের পানি প্রদানের নিশ্চায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। কেননা নৌ চলাচল পথের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতেই থাকছে।

শ্রীলংকা ঃ সমুদ্রসীমা নির্ধারণের দিক থেকে শ্রীলংকা বাংলাদেশের বিপরীত রাষ্ট্র। তাই মহীসোপানের সীমানা নির্দিষ্টকরণে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া সমুদ্র পথে পশ্চিমে যাওয়ার জন্যে বাংলাদেশকে শ্রীলংকার কলম্বো বন্দর ব্যবহার করতে হয়। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশ শ্রীলংকার 'Indian Ocean as a Zone of Peace' প্রস্তাবেরও অন্যতম সমর্থক। কেননা শ্রীলংকার এ প্রস্তাবেও বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিদ্যমান।

ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা বিবেচনার একটি অন্যতম দৃষ্টিকোণ হলো প্রাকৃতিক অবস্থা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Calamity) বহির্বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্রের সাথে তাকে সম্পর্ক উন্নয়নে বাধ্য করেছে। বলা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের নিত্যসাথী। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-বন্যা প্রায় প্রতি বছরই মারাত্মকভাবে আঘাত হানে এ জনপদে। শুধু বন্যা সম্পর্কেই এক সমীক্ষার রিপোর্ট হলো ঃ

"Bangladesh would be visited by normal floods every 2 years, moderate or moderately severe floods in 4 years,

www.pathagar.com

severe floods in 7 years and catastrophic floods in 33 to 50 years."[১১৪]

১৯৬৩ সাল থেকে এ যাবৎ সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ এবং তার ফলে ক্ষয়ক্ষতির একটি চিত্র নিচের টেবিল থেকে পাওয়া যাবে।

সূচী ঃ ৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের খতিয়ান

সন/মাস	এলাকা	ঝড়/বেগ	জলোচ্ছাস/ উচ্চতা	অন্যকিছু	নিহতের সংখ্যা	অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি
মে ১৯৬৩	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজার	ঘন্টায় ১২৫ মাইল	৮–১২ ফুট		১১,৫২০ জন	
মে ১৯৬৫	বরিশাল	১০০ মাইল	১২ ফুট		১৯,২৭০ জন	
ডিসেম্বর ১৯৬৫	কক্সবাজার, টেকনাফ	১৩০ মাইল	৮–১০ ফুট		৮৭৩ জন	কক্সবাজারে ৪০ হাজার সল্ট বেড় ডুবেযায়।
অক্টোবর ১৯৬৬	সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	ঘূর্ণিঝড়	২০–২২ ফুট		৮৫০ জন	
নভেম্বর ১৯৭০	ভোলা	১৩৮ মাইল	১০–৩৩ ফুট		প্রায় ৩ লাখ	
মে ১৯৮৫	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী সন্দ্বীপ, কক্সাবাজার হাতিয়া, উড়িরচর	৬৬ মাইল	১৪ ফুট		১১,০৬৯ জন	১,৩৫,০৩৩ গবাদিপশু
নভেম্বর ১৯৮৮	সুন্দরবন, খুলনা	৯৬ মাইল	১৪·৫ ফুট (মংলা পয়েন্ট)		৫,০৭৮ জন	সুন্দরবনের১৫ হাজার হরিণ ৯টি রয়েল বেঙ্গলটাইগার ৬৫ হাজার গবাদি পশু এবং৯৪১ টাকার ফসল
এপ্রিল ১৯৯১	সাতক্ষীরা–টেকনাফ (উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৪৭টি থানা)	২২৫ কিমি·	১৫–২০ ফুট	সাইক্লোন হ্যাকিন	প্রায়২ লাখ	

www.pathagar.com

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে বছরের পর বছর এ জাতীয় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া অত্যন্ত কঠিন। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে বিভিন্ন দাতা দেশগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়। এটি এদেশের একটি অন্যতম ভূ-রাজনীতিক দুর্বলতা।

উপসংহার

উপরের সাধারণ আলোচনা থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতার প্রভাব অত্যন্ত বেশী এবং সুদূরপ্রসারী। এ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিক বিষয়গুলোকে বিবেচনায় এনে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি রচিত হওয়া প্রয়োজন। অত্যন্ত স্পর্শকাতর ফারাক্কা ইস্যুসহ অন্যান্য কিছু নদী সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে যথোপযুক্ত কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে সমুদ্র সীমা নির্ধারণী প্রশ্নে এমন বাস্তবমুখী ও যুক্তিনির্ভর পদক্ষেপ নেয়া জরুরী যা দক্ষিণ তালপট্টি সমস্যার ইনসাফপূর্ণ সমাধান ঘটিয়ে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগকে করবে অবারিত। একটি শক্তিশালী ও বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের পাশে ভৌগলিকভাবে ছোট ও দরিদ্র একটি দেশের অবস্থানগত দুর্বলতার বিষয়টি স্মরণে রেখে অত্যন্ত স্থির ও সূক্ষ্মতার নিরিখে ভারতের সাথে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত। পাশাপাশি ১৯৭৮ এবং '৯১-এর অনাকাঙ্খিত অভিজ্ঞতার আলোকে মায়ানমারের সাথে নতুন মূল্যায়নে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন এবং অন্যদিকে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টিও মীমাংসিত হওয়া দরকার। নিকটবর্তী পরাশক্তি চীনের সাথেও আমাদের সম্পর্ক হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ-বন্ধুবৎসল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের নিত্যসাথী। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রাক্কালে এ অনতিক্রম্য-অনিবার্য বিষয়টির কথাও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না।

সবশেষে বলবো, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের এমনি একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে একদিকে "কারো সাথে বিরোধ নয়, সবার সাথেই

---

১১৪. Shaukat Hassan and Abdur Rob Khan, *'Bangladesh Floods : The Political Debate'* in M. G. Kabir and Shaukat Hassan (ed), *'Issues and Challenges Facing Bangladesh Foreign Policy'*, BSIS, 1989, p-80.

www.pathagar.com

সৌহার্দ্য" [Friendship to all, malice to none] নীতি এবং সেই সঙ্গে ন্যায্য জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদাসচেতন, দৃঢ় এবং অনড় থেকে অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com